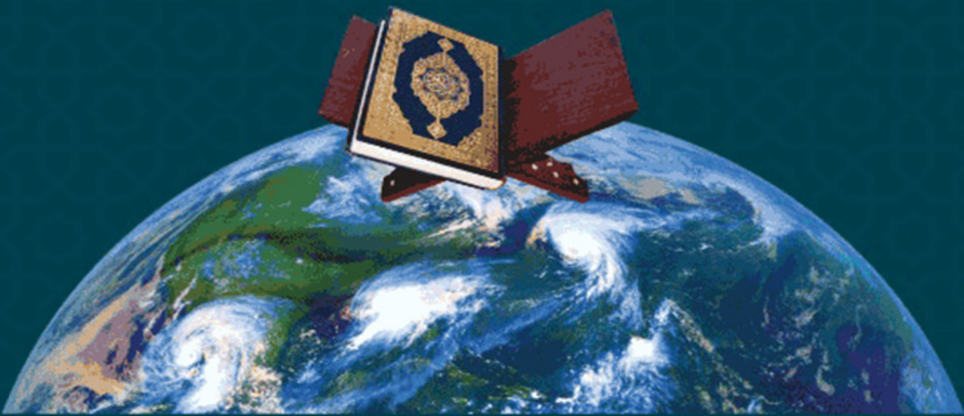
আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক



খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

KAA Publication

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ ঈসায়ী

প্রকাশক
ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
আলী সেন্টার (৪র্থ তলা)
সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭৪২ ৬৩৭৫৪৫ / ০১৭৩৭ ৯১৩৪৬৩
www.khanqaaminiaasgaria.000webhostapp.com
khanqaaminia@gmail.com

প্রচ্ছদ
আহসান হাবীব

মুদ্রণ
হরফ মিডিয়া
বন্দরবাজার, সিলেট, +৮৮০১৭২৩০৯৫৩৭৬

দাম
২০০ টাকা

Al-Quran O Adhunik Biggan - Al-Quran and Modern Science by Professor Dr. Syed Badiuzzaman Faruque, Professor of Physics at Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, BD. Published by Engineer Azizul Bari, Khanqa-e-Aminia-Asgaria, Ali Centre (3rd Floor), Subidbazar, Sylhet, Bangladesh. Date of Publication: August 2020. Price: Tk 200.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রকাশকের কথা

আমরা বড়ো সৌভাগ্যবান। বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী, শাবিপ্রবি'র পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান, সম্মানিত প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক সাহেবকে এ মূল্যবান গ্রন্থের লেখক হিসেবে পেয়েছি। এ যুগে একজন উচ্চপর্যায়ের বিজ্ঞানী, ইসলামের একান্ত অনুগত, আধ্যাত্মিকভাবে উচ্চপর্যায়ে আরোহণকৃত এবং সুলেখক ও গবেষক একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া সত্যিই বিরল। আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাই- উক্ত সবগুলো গুণের অধিকারী হচ্ছেন অত্র গ্রন্থের প্রণেতা। এ ক্ষুদ্র কিন্তু মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব পেয়ে আমি সত্যিই উৎফুল্ল হয়েছি। শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আল্লাহর পবিত্র দরবারে।

পাঠক, বিজ্ঞানের এক চরম উন্নতির যুগে আমরা বাস করছি। বিজ্ঞানের সঠিক স্বরূপ ও ইসলাম ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে এ যুগের মানুষ এক ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা আক্রান্ত- তাহলো, বিজ্ঞান ও ইসলামের মধ্যে সংঘাত বিদ্যমান। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, এ ধারণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বৈজ্ঞানিক কোনো সত্য তথ্যের সঙ্গে সত্যধর্ম ইসলামের কোনো বিশ্বাস-আক্বিদা সংঘাতময় হতে পারে না। কারণ সত্যের সাথে সত্যের সংঘাত মৌলিকভাবেই যুক্তিবিরুদ্ধ। আল-কুরআনের বেশ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য-তত্ত্বের আলোকে এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জমান ফারুক সাহেব। এ গ্রন্থটি মনোযোগসহ পাঠ শেষে আপনি নিশ্চয়ই ইসলাম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কথিত সংঘাত সম্পর্কিত সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবেন- আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটি।

গ্রন্থের সম্মানিত লেখক ও এটি প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। খাস করে খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সম্মানিত পরিচালক খলিফায়ে কুতবে যামান হযরত শায়খে কাতিয়া রাহিমাহুল্লাহ, শায়খ হযরত মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী দা.বা. এর প্রতি আমি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ জ্ঞাপন করছি। খানক্বাহর প্রকাশনা বিভাগ থেকে গ্রন্থ প্রকাশসহ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবৎ অতি সুন্দরভাবে পালিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আরো যাদের কথা এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা জরুরি মনে করছি তাঁরা হলেন লেখক-গবেষক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, কবি ও লেখক-গবেষক শায়খ আবদুল মুকিত মুখতার ও লেখক ড. মোহাম্মদ শামীম খান। এরা সবাই খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার সুহৃদ শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভানুধ্যায়ী, সমর্থক ও সহযোগিতাকারী। সবার প্রতি আমি বিভিন্ন দিক থেকে চিরঋণী।

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রকাশিত এ গ্রন্থ থেকে সবাই উপকৃত হবেন এই আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনকে বুঝার সঠিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা দান করুন। আমীন।

-প্রকাশক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার পরিচালকের পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিল করেছেন সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনে করিম। নবী-রাসূলদের আগমনের সমাপ্তির সাথে সাথে ওহির্জ্ঞান অবতীর্ণেরও সমাপ্তি ঘটেছে। সুতরাং সর্বশেষ অহির্জ্ঞানের কিতাবে আল্লাহ তা'আলা যাকিছু মানবজাতির হিদাআয়াতের জন্য প্রয়োজন সবই সন্নিবেশিত করেছেন। দুনিয়া-আখিরাতে মানুষের সাফল্য কীভাবে নিশ্চিত হবে তা সবই কুরআনে পাকে দিকনির্দেশনা করা হয়েছে। সৃষ্টজগত ও এর কার্যকারিতা নিয়েও কুরআন শরীফে অনেক তথ্য ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা কুরআন হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ মহাসত্যের জ্ঞানভাণ্ডার। এখানে সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বর্ণনা বিদ্যমান। মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এসব তথ্য ও দিকনির্দেশনা দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে। কুরআন শরীফেই আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

-"আমি এ কুরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে।" (যুমার (৩৯): ২৭)

সুতরাং মানুষের হিদাআতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুক্তিতর্ক, বস্তুজগতের সৃষ্টিকৌশল, অতীত ইতিহাস ইত্যাদি দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁর পবিত্র কালামে। আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও বেশি পূর্বে নজিলকৃত কুরআন শরীফে যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়- তা আধুনিক যুগে এসেও বিস্ময়াবিভূত হয়ে লক্ষ্য করছেন তাবৎ দুনিয়ার বড়ো বড়ো বিজ্ঞানী ও গবেষকরা। কুরআন শরীফ যে, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই বিশুদ্ধ বাণী তা সে যুগে, এ যুগে এবং সর্বযুগেই মানুষ জেনে আসছে ও জানবে।

প্রফেসর ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক সাহেব আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ও মুহাব্বাতের ব্যক্তি। বিজ্ঞান দ্বারা এ যুগের মানুষ যাতে ইসলাম ও এর গুরুত্বপূর্ণ ঈমান-আক্বিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে না পড়ে- সেজন্যই তিনি অত্র গ্রন্থখানা রচনা করেছেন। এতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মোটেই আমাদের প্রাণের বিশ্বাসকে দুর্বল করে নি, করতে পারে নি- বরং আরো শক্তিশালী করবে। কারণ কুরআনের অনেক আয়াত আছে যেগুলো আজকের বিজ্ঞানের তথ্যাদি ও তত্ত্বের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। এমন একটিও আয়াত কেউ খুঁজে পায় নি- যা বিজ্ঞানের অকাট্য সত্যের সঙ্গে সংঘাতময়। এটা নিঃসন্দেহে কুরআনের ওহিসূত্রের সুস্পষ্ট দলিল। সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং নিজে ছাড়া সৃষ্টিসম্পর্কে সে যুগে মানুষের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয়গুলোর বিশুদ্ধ বর্ণনা উপস্থাপন সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।

আমি আশা করি এ ছোট্ট অথচ গুরুত্ববহ গ্রন্থখানা পাঠ করে সকলেই যুগ যুগব্যাপী উপকৃত হবেন। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যারা মানুষকে ইসলাম ধর্মবিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের জন্যও এ গ্রন্থখানা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপিত হবে। এছাড়া বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কুরআনের ওপর তুলনামূলক আলোচনাসর্বস্ব এ গ্রন্থটি ইসলামী সাহিত্যেরও এক অনবদ্য সংযোজন হয়ে থাকবে বটে।

আমি গ্রন্থকার, প্রকাশক ও পাঠকদের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। আমি দুআ করি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে এ গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত করবেন। এটি বহুলপঠিত একটি গ্রন্থ হোক- সেটাও কামনা করছি মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে। গ্রন্থকারসহ প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাইকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

ফারুক আহমদ
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া
সিলেট, ১২ জুলাই ২০২০।

সূচি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

আল্লাহকে দেখা যায় যখন আমরা মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো নিয়ে ভাবি। পৃথিবীর পরিবেশে জীবন যেমন লভ্য, মহাবিশ্বের অন্যত্র তেমন নয়। জীবন তথা উদ্ভিদ ও প্রাণির গঠন উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার মাধ্যমে পাওয়া যায়। জীবনের নিগূঢ় রহস্য বায়োলজির মাধ্যমে উন্মোচিত হয়। বায়োলজি সবচে মৌলিক কোনো জ্ঞান নয়। বায়োলজির জ্ঞান রসায়নবিদ্যা বা কেমিস্ট্রির মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। রসায়ন শাস্ত্র সবচেয়ে মৌলিক নয়। রসায়ন বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের মাধ্যমে উৎপন্ন। আর পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্বের পুরোটাই ব্যাখ্যা করে বস্তুনিচয়ের মাঝে ক্রিয়াশীল ক'টি বল বা শক্তির সাহায্যে। দেখা গেছে, মহাবিশ্বের সকল কিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় চারটি মৌলিক শক্তির মাধ্যমে। এগুলো হলো- (১) মহাকর্ষ বল, (২) তড়িৎচুম্বকীয় বল, (৩) দুর্বল নিউক্লিয় বল ও (৪) সবল নিউক্লিয় বল।

গত শতাব্দির শেষ ভাগে এসে জানা গেছে যে, মৌলিক বল তিনটি। অর্থাৎ উপর্যুক্ত (২) ও (৩) নং বল- একই শক্তির দু'টি রূপ। ফলে মহাবিশ্ব শাসন করে মহাকর্ষ, ইলেকট্রোউইক ও সবল নিউক্লিয় বল। এখন বিজ্ঞানীরা প্রায় প্রমাণ করে ফেলেছেন যে, ইলেকট্রোউইক ও সবল নিউক্লিয় বল আসলে একই শক্তির দুটি রূপ। তাহলে মহাবিশ্ব শাসন করছে মোটে দুটি বল, যথা মহাকর্ষ ও অন্য একটি যেটি মূলত তড়িৎ চুম্বকীয়, দুর্বল নিউক্লিয় ও সবল নিউক্লিয় বলের একীভূত রূপ। এবারে দেখুন- বিজ্ঞানীরা জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা প্রমাণ করতে যে, মৌলিক বল মোটে একটি। অর্থাৎ উপরোল্লিখিত চারটি শক্তির একটি একীভূত রূপ আছে। সেটাই অর্থাৎ একটি একক শক্তির মাধ্যমে জগৎ শাসিত হয়। এই যে একমুখিনতা অর্থাৎ একক শক্তির বহিঃপ্রকাশ তা কি একক শক্তির একক মালিকের দিকেই আমাদেরকে ধাবিত করছে না? মহাবিশ্বের বৈচিত্র্য যদি বৈচিত্র্যই হয়ে থাকত- তবে আমরা একক স্রষ্টায় বিশ্বাস না করেও পারতাম। কিন্তু মহাবিশ্বের বৈচিত্র্যের গভীরে রয়েছে

কেন্দ্রিকতা, একক শক্তির অস্তিত্ব। তাহলে একক স্রষ্টা সেই একক বলের মালিক- এতো এক ধ্রুব সত্যের নামান্তর। এই আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, মহাবিশ্বের শক্তিগুলোর একমুখিনতা রয়েছে আর সেই একমুখিনতা- একক স্রষ্টার চেহারাই পরিস্ফুট করেছে।

১। দার্শনিক প্রমাণ

ইতিহাসে বিরাট এক সময়কাল অতিবাহিত হয়েছে যখন জানা ছিলো না যে, মহাবিশ্বের শুরু বা সৃষ্টিক্ষণ ছিলো কি না। মাত্র বিংশ শতাব্দিতে এসেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মহাবিশ্ব আজ থেকে মোটামুটি ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে বিগব্যাং নামের এক মহাবিস্ফোরণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অর্থাৎ মহাবিশ্ব অনাদি নয়, এর প্রারম্ভ আছে। শুধু এতটুকু একটি তথ্য এক মহাজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছে। যদিও এই দার্শনিক জ্ঞান যখন উন্মেষ লাভ করেছিল তখন- মহাবিশ্বের প্রারম্ভ আছে কি না তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিলো না। কিন্তু কুরআনিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে দার্শনিক ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ (১০৫৮-১১১১) এক মহাদার্শনিক যুক্তির অবতারণা করলেন। একে বলে Sillology। তিন ধাপের যুক্তির প্রমাণ।

ইমাম গাযালী বললেন- (ক) যা কিছু শুরু আছে, তার পেছনে কারণ ক্রিয়াশীল, (খ) মহাবিশ্বের শুরু আছে তাই, (গ) মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে কারণ ক্রিয়াশীল। ফলে- সেই কারণ একক হবে কেননা- মহাবিশ্ব একক। সেই একক কারণ মহান স্রষ্টা- আল্লাহ। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি যে, বহু দার্শনিকের মত হলো এ বিষয়ে বার্টান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ভুলের উপর ছিলেন। তিনি বলেন, সবকিছুর পেছনে কারণ ক্রিয়াশীল থাকা যদি সাব্যস্ত হয়, তবে খোদার অস্তিত্বের পেছনেও অন্য কারণ ক্রিয়াশীল থাকতে হবে। রাসেলের এই যুক্তি ইমাম গাযালীর Sillology যাকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নাম দিয়েছেন- Kalam cosmological argument, দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়। যার শুরু আছে কেবল তার জন্যই কারণ ক্রিয়াশীল সাব্যস্ত। যার শুরু নেই তার পেছনে কোনো কারণ থাকবে না। এ জন্যই-

খোদা যেহেতু অনাদি, তাঁর অস্তিত্ব কারণবহির্ভূত। এ প্রসঙ্গ এটুকুই যে, একক মহাবিশ্বের শুরু আছে বলেই তার অস্তিত্বের পেছনে একক কারণ তথা স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের ভূমিকা রয়েছে। এভাবে আবারও আমরা প্রত্যক্ষ করলাম মহান আল্লাহর গোপন চেহারা।

২। আল-কুরআন

আল্লাহ্ তা'আলাকে পাওয়া যায় তাঁর বাণীর মাধ্যমে। আল-কুরআন এক অলৌকিক কিতাব। এই যে-সকল অজানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে- তা তখনকার জগতে কোনো মানুষের জানাটা ছিলো অসম্ভব। ফলে- বিগত চৌদ্দ শত বছর ধরে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব পৃথিবীবাসীর কাছে দিবালোকের মতো সত্য হয়ে ধরা দিয়েছে। আল্লাহকে দেখা যায় আল-কুরআনের দৃষ্টি দিয়ে, সে-দৃষ্টির সাথে মহাবিশ্বের জানা দৃশ্যাবলির সাদৃশ্য দিয়ে। আল্লাহ নিজেও বলেন:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

"Soon will We show them our Signs in the [furthest] regions [of the universe], and in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth."

"এখন আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা-ই (আল-কুরআন) সত্য" (সূরা হা-মীম সিজদাহ (৪১): ৫৩ অংশ)।

আল্লাহর এই বাণীর মর্ম হলো- আল-কুরআনে যেসব বৈজ্ঞানিক বিষয় রয়েছে তা একে একে মানুষের কাছে সত্য বলে প্রমাণিত হবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে। আল্লাহ যে বলেছেন, আমি তোমাদের দেখাবো আমার নিদর্শনাবলী, এর মানে হলো- মানুষ তার সৃষ্টিশক্তি বলে এমনসব বিষয় আবিষ্কার করবে যা আল্লাহর বাণীর সাথে সামঞ্জস্যশীল।

আল-কুরআন মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলার এক বড়ো আমানত। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ * إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Verily, We offered the Trust (of Quran) to the heavens and the earth and the mountains, but they refused to bear it and are afraid of it. But man bore it. Indeed, he is (capable of being) unjust to, and neglectful of, himself."

"অবশ্যই আমি (কুরআন এর) আমনত (এক সময়) আসমানসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে পেশ করেছিলাম, তারা এটা বহন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো, সবাই এতে ভীত হয়ে গেলো, অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিলো; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত জালিম ও একান্তই অজ্ঞ।" (আহযাব (৩৩): ৭২)

এই আয়াতের আলোকে বলা যায়, কুরআনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মানুষ তিন অবস্থার কোনো একটি অবস্থায় থাকে:

(১) যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে না এবং এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করে না।

(২) যারা জাহিল তারা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করা তো দূরের কথা, কুরআন অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টাও করে না।

(৩) যারা আলিম, তারা কুরআন অধ্যয়ন করেন, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। আর কুরআন থেকে আল্লাহর নিদর্শন লাভ করেন।

আল-কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনার কয়েকটি ক্ষেত্র আছে:

(১) আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা।

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা।

(৩) দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও অসারতা নিয়ে ভাবা।

(৪) আখিরাত নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

(৫) প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শন যা কুরআনে পাওয়া যায়, সেগুলো আহরণ করা ও প্রচার-প্রসার করা।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উক্ত ৫ম তরিকার অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশ প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে আল্লাহর নিদর্শনমূলক। আমরা সেসব থেকে কিছু মূল্যবান অংশ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তুলে ধরেছি। আশাকরি পাঠক অনেক ঋদ্ধ হবেন এই গ্রন্থ পাঠ করে।

গ্রন্থের ভূল-ত্রুটির জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আর পাঠকবর্গ যদি কোনো অসঙ্গতি পান- তা জানালে পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

পরিচ্ছেদ ১

আল্লাহর ওয়াদা ও মহাবিশ্বে বৈজ্ঞানিক নিদর্শন

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ * أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Soon will We show them our Signs in the [furthest] regions [of the earth], and in their own souls, until it becomes manifest to them that this is the Truth. Is it not enough that thy Lord doth witness all things?"

"এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কুরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়?" (হা-মীম সিজদাহ (৪১): ৫৩)

এই আয়াতে করীমায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এক অমোঘ সত্য উন্মোচন করেছেন। আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো- আল-কুরআন অবশ্যই এক সত্যবাহী কিতাব যার উৎস আল্লাহ স্বয়ং। আর তিনি বলছেন যে, মানুষ যা জানে, মানে, বিশ্বাস করে- সে সকল মাধ্যমেই বুঝতে পারবে যে, আল-কুরআন সত্য।

এখানে এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর অগণিত অসংখ্য নিদর্শনের দিকে ইঙ্গিত দিয়ে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি মানুষকে ধাবিত করেছেন। তা এই যে, আধুনিক কালের আগমনের সাথে সাথে ধীরে ধীরে এমন সব বিষয় আবিষ্কৃত হবে যা মানুষ অকাট্য সত্য বলে মেনে নেবে। অন্যদিকে তাদের ঝোঁক হলো- কুরআনের সত্যতা অস্বীকার করা। কিন্তু আল্লাহ বলছেন যে, ঐসব আবিষ্কার যা তারা করবে তার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ তা'আলার

অবতারিত কুরআন সত্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন থেকে আরো কিছু আয়াত পেশ করা হলে বর্তমান আয়াতের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হবে। প্রথমেই ধরুন সূরা আম্বিয়ার ৩০তম আয়াত।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا * وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ * أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"Do not the Unbelievers see that the heavens and the earth were joined together [as one unit of creation], before we clove them asunder? We made from water every living thing. Will they not then believe?"

"অবিশ্বাসীরা কী দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে আবদ্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (আম্বিয়া (২১): ৩০)

উপর্যুক্ত এই আয়াতের বিষয়বস্তু অতি আধুনিক তথা বিংশ শতাব্দির এবং এটি পৃথিবীর বিষয় নয় বরং মহাবিশ্বের বিষয়।

মহাবিশ্ব নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে এবং তখন Edwin Hubble (1989-1953) এর গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় যে, মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিসমূহ একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। অন্যকথায়, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ সুদূর অতীত থেকে আজো বিদ্যমান। এখন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পেলেন যে, নিশ্চয়ই এমন একটি সময় ছিলো যখন মহাবিশ্বটা একটি বিন্দুতে জমাটবাধা প্রচণ্ড চাপ, তাপ ও শক্তির মধ্যে ছিলো। অতঃপর একসময় এক মহাবিস্ফোরণে ঐ বিন্দুটি থেকে মহাবিশ্বের সূত্রপাত এবং সম্প্রসারণ। সুতরাং আল-কুরআনে বিবৃত (২১:৩০) আয়াতের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে সত্য প্রতিভাত হলো কুরআন অবতীর্ণ হবার ১৪০০ বছর পর। এটাই আল্লাহ বলছেন যে, তিনি নিদর্শন

দেখাবেন। নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের মহাবিস্ফোরণ এবং সম্প্রসারণ বড় এক নিদর্শন এবং এই নিদর্শন কুরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং আল-কুরআন সত্য বলে প্রমাণিত হলো।

এই প্রসঙ্গে আরো সরাসরি বক্তব্য হলো:

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

“And the sky was built by Us with might, and indeed, We are the one who expands (it).”

“আমরাই মহাশক্তি বলে আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছি এবং নিশ্চয়ই আমরাই (এর) সম্প্রসারণকারী।” (জারিয়াত (৫১): ৪৭)

অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ এখানে মহাবিশ্বের এক গোপন কাহিনী বর্ণনা করলেন। আল্লাহই আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা আর আল্লাহই এর সম্প্রসারণকারী। আর সম্প্রসারণ সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি এটি এক বৈজ্ঞানিক সত্য যা বিংশ শতাব্দিতে এসে ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে। সুতরাং পুনরায় আল্লাহর নিদর্শন দেখা গেলো বাস্তবে যা আল-কুরআন বলেছে ১৪০০ বছর আগে।

মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আরো একটি নিদর্শন হলো- মহাবিশ্বের তারকারাজি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের সাথে সাথে দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। এমন দূর যে তা টেলিস্কোপের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটাকে এককথায় বলা যায় তারকারাজির অস্তাগমন। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

“Then I swear by the setting of the stars.”

“অতএব, আমি তারকারাজির অস্তাচলের শপথ করছি,” (ওয়াক্বিয়াহ (৫৬): ৭৫)

অর্থাৎ, আল্লাহই মহাবিশ্বকে সম্প্রসারিত করছেন এবং এর ফলে তারকারাজি অস্তামিত হচ্ছে।

আল-কুরআনে আরো আছে:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

"By the Sky with [its] numerous Paths,"

"পথসমূহবিশিষ্ট আকাশের শপথ," (জারিয়াত (৫১:৭)

এই বিষয়টি উপর্যুপরি তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক। কেউ জানতো না বিংশ শতাব্দির পূর্বে যে- মহাকর্ষ মহাবিশ্বের স্থান-কালকে প্রভাবিত করে এমনভাবে যে- মনে হয় আকাশের সর্বত্র পথরেখা আছে। এটি আইনস্টিইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) General Relativity'র আবিষ্কার যে, মহাকর্ষ মহাবিশ্বকে জ্যামিতিকভাবে প্রভাবিত করে এবং সর্বত্র পথরেখা তৈরি করে রেখেছে। কোনো তারকা বা গ্রহ কোনো বল বা force দেখে না বরং দেখে পথরেখা এবং ঐ পথরেখা ধরেই ওরা চলে।

পরিচ্ছেদ ২

মানবের সৃষ্টি ও শিক্ষা

হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওহীর আগমন প্রথমবার হেরা পর্বতের গুহায় হযরত জিবরাইল (আ.) এর মাধ্যমে। সেই প্রথম ওহীর প্রথম পাঁচটি আয়াত অত্যন্ত গভীর অর্থবহ। আল্লাহ বলেছেন:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ *خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ *عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

"Proclaim! [or read!] In the name of thy Lord and Cherisher, Who created- Created man, out of a [mere] clot of congealed blood: Proclaim! And thy Lord is Most Bountiful,- He Who taught [the use of] the pen,- Taught man that which he knew not."

"(হে মুহাম্মদ), তুমি পড়ো, (পড়ো) তোমার মালিকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্ত থেকে, তুমি পড়ো এবং (জেনে রাখো) তোমার মালিক বড়ই মেহেরবান, তিনি (মানুষকে) কলম দ্বারাই (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিখিয়েছেন, তিনি মানুষকে (এমন সবকিছু) শিখিয়েছেন যা (তিনি না শেখালে) সে কখনও জানতে পারতো না।" (আলাক্ব (৯৬): ১-৫)

এখানে আল্লাহ সুস্পষ্ট করেছেন মূলতঃ দুটি বিষয়। বর্তমানে যেমন, তেমনি অতীতেও এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির নিকট বর্তমান ছিলো যে, মানুষ ও অপরাপর সকলকিছু প্রকৃতির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। অর্থাৎ প্রকৃতিই মানুষের স্রষ্টা। এ যে কতো বড়ো ভুল, তা আল্লাহ সর্বশেষ নবীর নিকট প্রথমবারেই ধরিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট। আর এই সৃষ্টি অত্যন্ত

অভিনব। মায়ের জরায়ুর গাত্রে ঝুলে থাকা জোঁকসদৃশ একবিন্দু জমাট রক্ত হলো মানুষের সৃষ্টির সূচনা যা আল্লাহর কৃতিত্ব। প্রকৃতির নয়।

আল কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ এই প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু ওহীর সূচনায় এই প্রসঙ্গ এনে আল্লাহ এক অমোঘ বাস্তবতার প্রতি মানবজাতিকে ডাকলেন। বললেন, ওহে মানুষ! তোমরা আমার সৃষ্টি। প্রকৃতির সন্তান তোমরা নও। তোমরা আমার সৃষ্ট জ্ঞানী এক সত্তা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো যে, মানুষ অপরাপর সকল সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ জ্ঞান ধারণ ও শিখন উপযুক্ত এক সৃষ্টি। আর জ্ঞানবিজ্ঞান মানুষ লাভ করে প্রকৃতি থেকে নয় বরং আল্লাহর নিকট থেকে। আল্লাহর শেখাবার প্রধান উপায় হলো কিতাব প্রেরণ। কিতাব লেখা হতো কলম দিয়ে। তাই আল্লাহ বলছেন, কলম দ্বারাই আমি শিখিয়েছি মানুষকে এমনসব বিষয় যা আমি না শেখালে মানুষ শিখতে পারতো না।

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের যুগপৎ স্রষ্টা ও শিক্ষক। যেমনিভাবে মানুষের আগমন অতীতকাল থেকে বহমান, তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞানও অতীতকাল থেকে এখনও আল্লাহরই শেখানো।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মানুষের জন্ম সূচনা হয় conception এর মাধ্যমে যাকে আমরা বলি গর্ভধারণ। তেমনি জ্ঞানবিজ্ঞান লাভ হয় conception এর মাধ্যমে। কোনো কিছুই তক্তায় পেরেক মারার মতো লেখা হয় না। জ্ঞানবিজ্ঞান প্রথমে ধরা পড়ে মানুষের মস্তিষ্কে- concept এর মাধ্যমে। অতঃপর মানুষ সেই concept কলম দ্বারা কাগজে লিপিবদ্ধ করে।

সুতরাং ওহীর সূচনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টিতে যুগপৎ বিদ্যমান দুটি বিষয় যাদের মূল একটি- তা আল্লাহ আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন, আর আমরা তা জানলাম তাঁর কাছ থেকে।

পরিচ্ছেদ ৩

ইলম আল্লাহর সম্পদ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"And say: My Lord improve me in knowledge."

"এবং বলুন: হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" (ত্বোয়া-হা (২০): ১১৪)

বক্ষমান আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদেশ করছেন যেনো আমরা তাঁর কাছে জ্ঞানবৃদ্ধির আবেদন করি। মানুষই মূলতঃ জ্ঞানী সত্তা সৃষ্টিকূলে। এই জ্ঞান মানুষের কাছে আসে তিন ভাবে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। পঞ্চেন্দ্রিয় যেসব তথ্য পায় তা জ্ঞানের সর্বনিম্ন স্তর। অতঃপর ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্য মস্তিষ্কের বিশ্লেষণের মাধ্যমে উন্নত জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। এই দুইটি উপায়ই হলো প্রাকৃতিক জ্ঞান লাভের মাধ্যম।

কিন্তু জগৎ কেবল প্রকৃতি নয়। জগতের উর্ধ্বে রয়েছে অতিপ্রাকৃত আল্লাহর জগৎ। সেখান থেকে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ হয় দু'ভাবে। নিম্নস্তরে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ইলহাম আকারে মানুষের কাছে আসে। ইলহাম হলো বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যা কনসেপ্ট (concept)। কিন্তু বৈজ্ঞানিক কনসেপ্ট ও ইলহামের মধ্যে পার্থক্য আছে। আল্লাহ প্রদত্ত ইলহাম ইশারা, ইঙ্গিত, শব্দ বা ছবি আকারে মানুষের হস্তগত হয়। আর প্রাকৃতিক কনসেপ্ট মস্তিষ্কের বিশ্লেষণ ভিত্তিক।

ইলহামের উচ্চ স্তর হলো ওহী। যা আসে আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি ফিরিশতার মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের কাছে।

এই গেলো জ্ঞান আহরণের তিনটি মাধ্যমের বর্ণনা।

অত্র আয়াতে আল্লাহ মূলতঃ ইন্দ্রিয়লব্ধ, মস্তিষ্কপ্রসূত ও ইলহামভিত্তিক জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আবেদন করার কথা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। ওহীভিত্তিক

জ্ঞানবৃদ্ধির আবেদন সাধারণ মানুষের আওতা বহির্ভূত। কেবল নবী-রাসূলগণই ওহীভিত্তিক জ্ঞানবৃদ্ধির আবেদন করতে পারেন। অত্র আয়াতে আল্লাহ মূসা আলাইহিসসালামকে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এই আয়াতে জ্ঞানের সকল মাধ্যমে উন্নতিলাভের আবেদন করার নির্দেশ রয়েছে।

আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্য ইন্দ্রিয়লব্ধ, মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানতো বটেই, ইলহামভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধির আবেদন জানানো উচিত আল্লাহর কাছে। ইলহামের মাধ্যম অনেক। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান হলো সত্য স্বপ্ন। এরপর রয়েছে শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো ফিরিশতার পক্ষ থেকে কিছু জানা। তারপর রয়েছে এমন কিছু দৃশ্য দর্শন যা অন্যরা দেখে না। একে কাশফও বলা যায়। ইলহাম, কাশফ নেক বান্দাদের সম্পদ। কেবলমাত্র ওলীগণই ইলহাম ও কাশফের অধিকারী হয়ে থাকেন।

পরিচ্ছেদ ৪

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

"And the sky was built by Us with might, and indeed, We are the One who expands. "

"আর আসমান সৃষ্টি করেছি আমরা মহাক্ষমতাবলে এবং নিশ্চয়ই আমরা (একে) সম্প্রসারণ করি।" (জারিয়াত (৫১): ৪৭)

অত্র আয়াতের প্রসঙ্গে সামান্য আলোচনা পূর্বে (১ম আয়াতের ব্যাখ্যায়) করা হয়েছে। এখন আমরা আরো একটু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা পেশ করছি।

মহাবিস্ফোরণে (Big Bang) মহাবিশ্ব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ বুঝা যায় যখন দু'টি তারকা বা গ্যালাক্সির মধ্যবর্তী দূরত্ব সময়ের সাথে কীরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে তা জেনে। Big Bang তত্ত্ব আসার প্রথমদিকেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ধরা পড়ে। তখন দেখা গিয়েছিল যে, যে কোনো দু'টো গ্যালাক্সি বা তারকার মধ্যবর্তী দূরত্ব সময়ের সাথে বেড়ে যাচ্ছে। এই বেড়ে যাওয়ার মধ্যে দু'টো উপাদান জড়িত। এক হলো দ্রুতি। অথাৎ দূরত্ব বাড়ছে কী করে। একে সম্প্রসারণ বেগ বলা হয়। অতঃপর ঐ বেগ সময়ের সাথে বাড়ছে না কমছে সেটিও মাপা যায়। দেখা গিয়েছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রথম ধাপে সম্প্রসারণ বেগ কম ছিলো। আর বর্তমানে সম্প্রসারণ বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এই দু'টি পর্যায়কে বলা যায় ক্রমহ্রাসমান হারে সম্প্রসারণ ও ক্রমবৃদ্ধিমান হারে সম্প্রসারণ।

যেজন্য অতীতে এক মাহাকলে ক্রমহ্রাসমান হারে সম্প্রসারণ হচ্ছিলো তা হলো এই যে, তখন মহাবিশ্বের তারকা, গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর কাছাকাছি ছিলো- বিধায় মহাকর্ষ বল খুবই শক্তিশালী ছিলো। মহাকর্ষ বল দু'টি বস্তুকে পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে দেয় না এর আকর্ষণ ধর্মের জন্য। যেহেতু অতীতের এক মহাকালে মহাকর্ষ বল শক্তিশালী ছিলো তাই মহাবিশ্বের

সম্প্রসারণ ক্রমহ্রাসমান ছিলো। আর মাহকর্ষ বল দূর্বল ও ডার্ক এনার্জির (Dark Energy) বিকর্ষণ বল সবল। সবল বিকর্ষণ বলের কারণে বর্তমানে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমবৃদ্ধিমান হারে।

এই সম্প্রসারণ সাধারণ কোনো বিষয় নয়। এর পেছনে রয়েছে মহাশক্তি। আর এই শক্তি আল্লাহর সৃষ্টি ছাড়া কিছুতেই দেখা যেতো না। আল্লাহই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আর আল্লাহই এর সম্প্রসারণকারী। কারণ মহাকর্ষ বলি আর ডার্ক এনার্জি বলি উভয়ই আল্লাহরই সৃষ্টি।

পরিচ্ছেদ ৫

তাছখির - ১

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ * وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

"And He has subjected for you the day and the night and the Sun and the Moon. And the stars (too) are in subjection by His command. Surely, in that there are signs for people who reflect."

"তিনি তোমাদের (সুবিধার) জন্য রাত, দিন ও চাঁদ সুরুজকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন; নক্ষত্ররাজিও তাঁর আদেশে নিয়ন্ত্রণাধীন (রয়েছে), অবশ্যই এর মাঝে তাদের জন্য (প্রচুর) নিদর্শন রয়েছে যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (নাহল (১৬): ১২)

অত্র আয়াতের প্রথম শব্দ 'سَخَّرَ' একটি ক্রিয়াবাচক শব্দ। এর সমার্থক বিশেষ্য হলো 'তাছখির'। তাছখিরের সমার্থক ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক শব্দ হলো fine tuning। Fine tuning এর ব্যাখ্যা হলো "সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ"। ভৌত বিশ্বে আশ্চর্যজনক এক নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে এবং এর সৃষ্টিতে রয়েছে এক সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ। সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাখ্যায় বলা যায়- কোনো কিছু নির্ধারণ করার সময় এর চূড়ান্ত পরিণতি যা হওয়া উচিৎ তার জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ামক বিষয়গুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এটাই fine tuning আর এটাই তাছখির।

জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করেছেন যে, এই মহাবিশ্ব, আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি, সৌরজগত এতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে fine tuning করা হয়েছে যে, এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে, একজন মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এগুলো তাঁর মহান কর্মকূশলতার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে যে, এই পৃথিবীতে জীবনের উপস্থিতি, বিশেষত মানবের অস্তিত্ব মহাবিশ্বের নিয়ামক রাশিগুলোর অতি ব্যাপক ও অতি সূক্ষ্ম fine tuning এর কারণেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাত, দিন সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও সূর্যের ঘূর্ণন গতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। এজন্যই অত্র আয়াতে রাত, দিন উল্লেখ এর পরপরই চন্দ্র, সূর্যের উল্লেখ হয়েছে। নক্ষত্ররাজিও আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং মানবের জীবনের সহায়ক হয়েছে fine tuning এর কারণে। এ সম্পর্কে আরো আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ৬

লৌহ প্রেরণ

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

"And We sent down iron, wherein is great might and benefits for the people."

"আর আমরা প্রেরণ করেছি লৌহ যার মধ্যে রয়েছে বিপুল শক্তি এবং মানুষের (আরো) উপকার।" (হাদীদ (৫৭): ২৫ - অংশ)

আল-কুরআনে কোনো পদার্থ যেমন অক্সিজেন, হাইড্রোজেন বা কার্বন সম্পর্কে এমন কোনো আয়াত নেই। কেবল এই আয়াতে লৌহ প্রেরণের কথা বলা হয়েছে। অন্যসব পদার্থ প্রেরণের কথা এজন্যই বলা হয় নি যে, সৌরজগত একটি গ্যাসীয় পিণ্ডের যাকে নেবুলা (nebula) বলে, তা থেকে সৃষ্টি যেখানে ভারী মৌলিক পদার্থ ছিলো না। ভারী মৌলিক পদার্থগুলো সৌরজগতের বাইর থেকে এসেছে। এ সম্পর্কে রয়েছে চমৎকার এক বৈজ্ঞানিক উপাখ্যান।

পৃথিবীর মতো একটি সবুজ গ্রহ সৃষ্টি হতে যেসব উপাদান প্রয়োজন সেগুলো সৃষ্টি হয় নক্ষত্রের উত্তপ্ত গর্ভে। যে ধরনের নক্ষত্র এজন্য প্রয়োজন তাদের নাম বাংলায় দেওয়া যেতে পারে "তাপ পরিচলন-সম্ভব নক্ষত্র"। ইংরেজিতে এগুলোর নাম convective star। একটি নক্ষত্রকে convective star বলা হয়, যখন নিউক্লিও-ক্রিয়াজাত উৎপাদিত তাপ এর পৃষ্ঠে পৌঁছায় মূলতঃ তাপের পরিচলন ক্রিয়ায়। যে বিক্রিয়ার মূল ঘটনা হলো বিশাল নাক্ষত্রিক পদার্থের পরিচলন। অর্থাৎ নক্ষত্রের কেন্দ্রর চারপাশ থেকে বিশাল এলাকার পদার্থ বিদ্যুৎ বেগে এর পৃষ্ঠের দিকে ধেয়ে যায়। আর এ ধরনের ঘটনা ঘটে ছোটো খাটো নক্ষত্রের বেলায় যাদেরকে বলা হয় "লাল বামন" (red dwarf) নক্ষত্র।

এর বিপরীতে রয়েছে, 'নীল বৃহৎ' (blue giant) নক্ষত্র। এদের ভেতরে তাপ কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণ করে মূলত বিকিরণের মাধ্যমে (বিকিরণ

হলো সূর্যরশ্মির মতো কিছু বিচ্ছুরণ)। এসব নক্ষত্রকে radiative star-ও বলা হয়। এখন সামনের কথাগুলো বুঝতে হলে দুটি বৈজ্ঞানিক রাশি প্রয়োজন। এর একটি হলো ‘আলফা’ (α)। আলফার মান ১/১৩৭ এবং এর কোন মাত্রা নেই। এই আলফাকে বলা হয় fine structure ধ্রুবক। এই সংখ্যাটি যে সকল স্থানে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ঘটনা ঘটে তেমন সকল স্থানেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এবার অন্য রাশিটির কথায় আসা যাক। এটি হলো ‘আলফা-জি’ ($^{\alpha}G$) অর্থাৎ এটি ‘মহাকর্ষীয় fine structure’ ধ্রুবক। যেসকল স্থানে মহাকর্ষ গুরুত্বপূর্ণ সেখানেই এটি ক্রিয়াশীল। এর মান অতি ক্ষুদ্র। অঙ্কে এটি হলো $১০^{-৩৮}$। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে এটি কতো ক্ষুদ্র! এটি একটি কেবলই সংখ্যা যার মাত্রা নেই।

এবার ফিরে আসা যাক convective এবং radiative star এর ক্ষেত্রে। এই দু’ধরনের নক্ষত্রের মাঝে বিভাজন রেখায় আছে এক critical ভর, যা নির্ভর করে ‘আলফা’ এবং ‘আলফা-জি’ এর উপর। এই critical ভর এর মান এমন যে, সকল তারকাই এই ভর এর কাছাকাছি ভরসম্পন্ন। আর এটি সম্ভব হয়েছে এ কারণেই যে, ‘আলফা’, ‘আলফা-জি’ থেকে $১০^{৩৬}$ গুণ বড়ো। আলফা-জি যদি আরো একটু বড়ো হতো, তাহলে সকল নক্ষত্র হয়ে যেতো Radiative। আর বড়ো না হয়ে আলফা-জি যদি একটু ছোট হতো, তাহলে সকল নক্ষত্র হয়ে যেতো Convective।

এখন যুক্তি রয়েছে যে, গ্রহ তৈরি হয় কেবল convective নক্ষত্রের পাশাপাশি। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, জীবনের উপস্থিতি কেবল কোনো গ্রহেই সম্ভব, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ‘আলফা-জি’, $আলফা^{২০}$ এর চেয়ে বড়ো হতে পারে না। অন্যদিকে যদি ‘আলফা-জি’ $আলফা^{২০}$ এর চেয়ে অনেক কম হয়, তবে সকল নক্ষত্র রাসায়নিকভাবে সুষম হবে এবং এসকল নক্ষত্র ভারী উপাদানসম্মৃদ্ধ হবে না।

এখানে লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ সৃষ্টি হতে ভারী উপাদান প্রয়োজন; আর এগুলো তৈরি হয় নক্ষত্রের উত্তপ্ত গর্ভে। নক্ষত্রের কেন্দ্রে থাকে সবচেয়ে ভারী উপাদান, যেমন লৌহ। তার পরবর্তী স্তরে থাকে এর চেয়ে

হালকা উপাদান, যেমন অক্সিজেন, কার্বন। অতঃপর আরো হালকা উপাদান। এ সকল উপাদান দিয়েই গঠিত হয় একটি গ্রহ। আর এই ভারী উপাদানগুলো গ্রহ তৈরি করতে আসে নক্ষত্রের এক বিশেষ বিস্ফোরণের মাধ্যমে। আর এই বিস্ফোরণে এরা নক্ষত্রের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাকর্ষ ও তাপ-চাপের কারণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভারী উপাদানগুলো জড়ো হয়ে তৈরি হয় একটি গ্রহ। তাহলে এই দাঁড়ালো যে, গ্রহ সৃষ্টির জন্য তারকার বিস্ফোরণ দরকার। এই বিস্ফোরণের নাম 'সুপার-নোভা' (Supernova) বিস্ফোরণ।

এখন যদি সকল নক্ষত্র রাসায়নিকভাবে সুষম হয় তবে সুপারনোভার সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে যে ভারী উপাদান মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে তা আর সম্ভব নয়। অর্থাৎ নক্ষত্রের সাধারণ গঠন এমন হতে হবে যেনো নক্ষত্রগুলো convective হয়। তবে অতি-convective নয়। আবার নক্ষত্রগুলো সব radiative হলেও চলে না। নক্ষত্রগুলো পূর্বোল্লিখিত critical ভরসম্পন্ন হতে হবে। তবেই কয়েকটি Supernova একটি গ্যালাক্সিতে শত বছরে তৈরি হবে এবং গ্রহ তৈরির সম্ভাবনা থাকবে।

সুতরাং একটি বাস্তব ঘটনা এবং পৃথিবীর ভেতরে লৌহজাতীয় পদার্থ এসেছে সূর্য বা এর পূর্ববর্তী নেবুলা থেকে নয় বরং অনেক অনেক Supernova বিস্ফোরণে এসব মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে বহুকাল পর পৃথিবীতে এসেছে। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতে বলছেন যে, তিনি লৌহ **প্রেরণ** করেছেন। **প্রেরণ** কাজটি সাধারণত দূর থেকে পাঠানোকে বুঝায়। অন্যকথায় আল্লাহ তা'আলা লৌহ নাজিল করেছেন; লৌহজাতীয় ও এরচেয়ে ভারী পদার্থ পৃথিবীতে আদি থেকে ছিলো না। পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েক কোটি বছরে লৌহ ও ভারী পদার্থগুলো মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে এসে জমা হয়েছে।

অত্র আয়াত তাই যুগপৎ তাছখির ও Supernova বিস্ফোরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আল্লাহু আ'লাম।

পরিচ্ছেদ ৭

আল্লাহর সৃষ্টি চলমান

إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا * وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ * إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

"It is Allah Who sustains the heavens and the earth, lest they cease [to function]: and if they should fail, there is none - not one - can sustain them thereafter: Verily He is Most Forbearing, Oft-Forgiving."

"আল্লাহ তা'আলাই আসমানসমূহ ও যমিনকে স্থির করে (ধরে) রেখেছেন, যাতেকরে ওরা বিচ্যুত না হতে পারে, যদি ওরা বিচ্যুত হয়েই পড়ে তাহলে, তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে, এদের উভয়কে (পুনঃ) স্থির করতে পারবে? অবশ্যই তিনি মহাসহনশীল ও ক্ষমাপরায়ণ।" (ফাতির (৩৫): ৪১)

অত্র আয়াতের প্রধান কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকে ধরে রাখেন যেনো ওরা নিজেদের কর্মে বিফল না হয়ে যায়। আরো এগিয়ে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলা প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টিকে জীবন দিয়ে চলেছেন। এই বিষয়টি কীভাবে আল্লাহ্ করেন তা একটি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে।

সকল সৃষ্টি মৌলিক কোয়ান্টাম কণার দ্বারা গঠিত। আর মৌলিক কোয়ান্টাম কণারা অস্থিত্ব আর অনস্তিত্বের মাঝে থাকে। যখন কোনো কোয়ান্টাম কণাকে দেখার বা পরিমাপের চেষ্টা না হয়- তখন সেই কণাটি কোথাও অবস্থান করে না। সেটি সম্পূর্ণ সম্ভাবনার অদৃশ্য জগতে অবস্থান করে। যখনই পরিমাপের বা দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখনই কেবল সেটিকে দেখা যায় বা সেটি তখনই তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এজন্যই এ্যারিস্টটল (৩৮৫ খ্রি.পূ. - ৩২৩ খ্রি.পূ.) বলেন, "All things produced either by nature or by art have matter; for each of them is capable both of being and of not being and this capacity is the matter in

each.” অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “One element is matter and another is form and one is potentially and the other actually.”

সুতরাং বুঝা গেলো, যা বস্তু তা মূলত সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনা বাস্তব রূপ লাভ করে কোনো দর্শকের দর্শন চেষ্টার মাধ্যমে।

এখন সহজেই প্রশ্ন করা যায়, এই সৃষ্টিজগতের অযুত-কোটি কোয়ান্টাম কণাকে প্রতি মুহূর্তে কে Observe (পর্যবেক্ষণ) করছে? উত্তর- আল্লাহ। এজন্যই আল্লাহ বলেন যে, তিনি বস্তুসমূহ তথা আসমান ও জমিনকে ধরে রাখছেন যেনো নিজ কর্মে বিফল না হয় বা নিজ অস্তিত্ব না হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি এতই প্রসারিত যে- সমগ্র সৃষ্টিজগত প্রতিমুহূর্তে প্রতিটি বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করছে। আর এই পর্যবেক্ষণই বস্তুসমূহকে জীবন দিয়ে চলছে। যেনো আল্লাহ প্রতিমুহূর্তে জগতের সবকিছুকে সৃষ্টি করে চলেছেন। দার্শনিক পরিভাষায় একে বলা হয় Creatio Continuan। অর্থাৎ চলমান সৃষ্টি প্রক্রিয়া। আল্লাহ তা’আলার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আরো দু’টি প্রক্রিয়া রয়েছে, সেগুলো হলো- Creatio Originan এবং Creatio Ex nihilio। অর্থাৎ আদি সৃষ্টি ও নাস্তি থেকে সৃষ্টি। আর বক্ষমান আয়াতে এসেছে Creatio Continuan বা চলমান সৃষ্টি।

পরিচ্ছেদ ৮

সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى *وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

"Glorify the name of your Guardian-Lord, Most High, Who has created, and further, given order and proportion; Who has ordained Law, and granted guidance."

"আপনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন এবং যিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তারপর পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।" (আ'লা (৮৭): ১-৩)

এখানে সৃষ্টির পর্যায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে ৪টি আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো পর্যায়ক্রমে, খালাক্বা, ফাসাওয়া, ক্বাদ্দারা ও ফাহাদা। খালাক্বা অর্থ সৃষ্টি করেছেন, ফাসাওয়া অর্থ সমন্বয় সাধন করেছেন, ক্বাদ্দারা অর্থ পরিমাণ নির্ধারণ ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং ফাহাদা অর্থ পথপ্রদর্শন করেছেন।

ক্বাদ্দারা শব্দটি দিয়ে যে দু'টি কাজ অর্থাৎ পরিমাণ নির্ধারণ ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বুঝায়, উভয়টি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড। প্রথমেই দেখুন, পরিমাণ নির্ধারণ করা তখনই সম্ভব যখন কোনো বস্তুর সকল গুণাবলী জানা থাকবে। যেমন বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) পূর্বে মানবজাতির অধিকাংশ লোক বস্তুর ওজন কীভাবে প্রকাশ করতে হয় তা জানতো না। নিউটন দেখালেন যে, বস্তুর ভর বলতে সেটির মধ্যে অবস্থিত পদার্থের মোট পরিমাণ ও ওজন বলতে ঐ বস্তুর উপর মহাকর্ষ বলের পরিমাণ বুঝায়। প্রশ্ন হলো- নিউটন কি বস্তুসমূহ সৃষ্টি করে তবে তাদের পরিমাণ নির্ধারণ করা ব্যাখ্যা করেছিলেন? অবশ্যই নয়। শতকোটি বছর পূর্বেই বস্তুসমূহ সৃষ্টি হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং তখন থেকেই বস্তুসমূহের প্রকৃতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তাহলে

আদিতে কে বস্তুসমূহের ভর পরিমাপ করেছে? উত্তর, স্রষ্টা আল্লাহ। যেমন ১টি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর ১টি প্রোটন ও ১টি ইলেকট্রনের ভরের সমষ্টি থেকে ওদের বাইন্ডিং শক্তির সমতূল্য ভর কম। এই ভর সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হলে জানতে হয় প্রোটনের ভর, ইলেকট্রনোর ভর ও তাদের মধ্যবর্তী সকলপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি। একজন স্রষ্টাই কেবল আদিতে এসবের নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রক হতে পারেন।

কোনো বস্তুর কোনো একটি ভৌত গুণ সংশ্লিষ্ট গাণিতিক রাশির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জাটিল ও ম্যাজেস্টিক ব্যাপার। মানুষের যে ক্ষমতা তাতে পৃথিবীস্থ কোনো বস্তুর কোনো একটি অংশ বেছে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু সূর্যের মতো কেনো বস্তুর ভর নিয়ন্ত্রণ করা কি কোনো মানুষের পক্ষে, তা তিনি যতোবড় বিজ্ঞানীই হোন না কেনো, সম্ভব? না, কখনই সম্ভব নয়। তাহলে কে নির্ধারণ করলো যে, সূর্য বা চন্দ্র বা অযুত কোটি অন্যান্য বস্তুর ভর এমন এমন হবে? উত্তর, স্রষ্টা আল্লাহ। অর্থাৎ বস্তুর গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহর হাতে- এবং এ কাজটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক।

বস্তুসমূহের বিভিন্ন গুণাগুণ সংশ্লিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কেনো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল? কারণ, আল-কুরআন অবতীর্ণ হবার চৌদ্দশত বছর পর আজ এসে বৈজ্ঞানিকগণ বলছেন যে, মহাবিশ্বে একটি সুনিয়ন্ত্রণ বা fine tuning রয়েছে। যে fine tuning এর কাজ এই যে, মহাবিশ্বের অযুত কোটি ভৌত ও জৈব বস্তুর গুণাগুণ ও পরিমাণ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে যেনো, পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষ নামীয় প্রাণিকূল অস্তিত্বে আসতে ও জীবনধারণ করতে সক্ষম হয়। পৃথিবীর মতো একটি গ্রহের ভারী উপাদানগুলো কোত্থেকে এলো? এসেছে অসংখ্য সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে, যে বিস্ফোরণে একটি অতি পরিবর্তিত নক্ষত্র, যার অভ্যন্তরে ভারী রাসায়নিক পদার্থগুলো সৃষ্টি হয়েছে, এ থেকে ভারী পদার্থ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং পরবর্তীতে তা পৃথিবীর মতো গ্রহে থিতু হতে পারে। এখন বৈজ্ঞানিকগণ দেখেছেন যে, ফাইন টিউনিংয়ের মাধ্যমে দুর্বল নিউক্লিয় বল ও বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলকে নিয়ন্ত্রণ না করা হলে মহাবিশ্বে সুপারনোভা সৃষ্টি

সম্ভব ছিলো না। এভাবে অনেক ফাইন টিউনিংয়ের প্রমাণ দেওয়া যায়, যার ফলশ্রুতি হলো মহাবিশ্বে পৃথিবীর সৃষ্টি ও সেই পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ও অবস্থান সম্ভব হয়েছে।

এখানে যে বিষয়টি অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বস্তুসমূহের মেনে চলা সূত্রসমূহ ও বস্তুসমূহের গুণাগুণসংশ্লিষ্ট পরিমাণ সুনিপুণ হাতে নিয়ন্ত্রণ করার ফলেই ফাইন টিউনিং সম্পন্ন হয়। তাই আল-কুরআনের আলোচ্য দু'টি আয়াতের প্রথমটিতে আল্লাহ বলছেন, “তিনি সৃজন করেছেন এবং যথাযথভাবে সমন্বিত করেছেন।” সৃষ্টির অযুত বিষয়ে শুধু সৃষ্টিই করা নয়, বরং সৃষ্টির একটি বিষয়ের সাথে অন্য সকল বিষয়কে এমনভাবে সমন্বয় করা হয়েছে যার ফলে এই মহাবিশ্ব তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। তবে বস্তুসমূহের গুণাগুণসংশ্লিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বস্তুসমূহ কী কী রূপে আবর্তিত-বিবর্তিত হবে- তা নির্ধারণ সম্ভব ছিলো না। তাই দরকার হলো- পরিমাপ করা, পরিমাণ নির্ধারণ করা ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। তখনই কেবল মহাবিশ্বের অযুত কোটি বস্তু ও বিষয় সম্মুখে অগ্রসর হবার দিশা পেতে পারে। এজন্যই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন, “তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।”

সৃষ্টিতে কার্য পরম্পরা

সৃষ্টি করা অর্থ কী জাতীয় পদার্থ তা নির্দিষ্ট করে মৌলসত্তা নির্ধারণ করা। ফাছাওয়া অর্থ- ইংরেজিতে - given order and proportion, সুবিন্যাস করেছেন। সুবিন্যাস করার একটি হলো বস্তু বা জীবের shape বা গঠনাকৃতি দেওয়া। এ গঠনাকৃতির ভেতর কোন কোন গুণাবলীর কী কী থাকবে তা দিয়ে দেওয়া। এই সুবিন্যাস করার উপর এই বস্তু বা জীব কী কী সূত্র মেনে চলবে তা নির্ভর করবে। যেমন: ১টি ইলেকট্রন এর ৩টি গুণগত ও একটি গঠনাকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জ, ভর ও স্পিন এবং এর গোলাকার গঠনাকৃতি। এখন ইলেকট্রনের ভর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা নির্ভর করে গঠনাকৃতির উপর। যদি কিউব আকৃতি দেওয়া হয় ইলেকট্রনকে

তবে তার একরকম হিসাব, যদি গোলাকার আকৃতি দেওয়া হয় ইলেকট্রনকে তবে তার হিসাব অন্যরকম। যদি সিলিন্ডার আকৃতি দেওয়া হয় তবে তার হিসাবটি আরোও অন্যরকম।

Order and proportion তথা সুবিন্যাসের পর যখন shape নির্ধারিত হয়ে সৃষ্টি করা হয়ে যায়, তখনই কেবল ভর নিয়ন্ত্রণের উপায় তৈরি হয়- তাই ফাছাওয়ার পর আসে ক্বাদ্দারা। অর্থাৎ পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ। কিসের পরিমাণ? ইলেকট্রনের বেলায় ভরের পরিমাণ, চার্জের পরিমাণ ও স্পিনের পরিমাণ। এগুলো shape ও তৎসংশ্লিষ্ট ফিল্ডের উপর নির্ভর করে। ফিল্ডও সেই order এর উপর নির্ভর করে। Order সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন, Nuclear Physics বা Particle Physics। আমরা জানি নিউট্রন একটি কণা যা পরমাণুর কেন্দ্রতে থাকে। এই নিউট্রনের মোট চার্জ শূন্য- কিন্তু এর একটি চার্জ স্ট্রাকচার রয়েছে। অর্থাৎ নিউট্রনের অভ্যন্তরে পজেটিভ চার্জ ফিল্ড ও বহিরঙ্গে নেগেটিভ চার্জ ফিল্ড রয়েছে। এজন্যই নিউট্রনের মোট চার্জ শূন্য হলেও এর রয়েছে চৌম্বকভ্রামক যা নেগেটিভ এবং এর কারণ হলো, এর বহিরঙ্গের নেগেটিভ চার্জ ফিল্ডের ঘূর্ণন।

এখন দেখুন, ফিল্ড বা পদার্থের মধ্যে কোনটি সামনে, কোনটি পেছনে বা কোনটি ভেতরে, কোনটি বাইরে থাকবে সেই বিষয়টি নির্ধারণ করা। যেমন নিউট্রনের বেলায় চার্জের ফিল্ড পজিটিভ ভেতর আর নেগেটিভ বাইরে আছে। এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, জগতের প্রত্যেকটি বস্তু জীব বা জড়, এদের মধ্যে order বা ক্রম এর বিরাট ভৌত ও জৈব প্রভার রয়েছে যা বিশ্ব নির্মাণে বিরাট সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা রেখেছে।

এবারে proportion এর বিষয়টি দেখুন। ইলেকট্রনের কথা ধরুন। ইলেকট্রনের চার্জ ও ভরের অনুপাত হলো একটি proportion। চার্জ/ভর এর উপর নির্ভর করে ইলেকট্রন কী ধরনের আচরণ করবে এবং এর ইলেকট্রিক ফিল্ড ও ম্যাগনেটিক ফিল্ড কীরূপ হবে তা-ও এই অনুপাতের উপর নির্ভর করে।

বস্তুর essence ও quality নির্ধারণ করার পরই কেবল কী ধরনের সূত্র দ্বারা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তা নিয়ে চিন্তা করা যায়। essence ও পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কেবল বস্তুকে কোনো সূত্র দিয়ে তার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। এটাই হলো হিদায়াত বা guidance।

লক্ষ করুন- সৃষ্টি, সুবিন্যাস, পরিমাণ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং সবশেষে সূত্র- একের পর এক পর্যায়ক্রমে scientific way-তে আসে। আল্লাহ যদি বলতেন, "আল্লাজি ক্বাদ্দারা ওয়া ফাছাওয়া", তবে বিষয়টি মোটেও scientific chronology-তে পড়তো না। বিষয়টি scientific ও chronologic হয়েছে যে ক্রমানুসারে আল্লাহ কুরআনের সূরা আল-আ'লায় 'খালাক্বা, ফাছাওয়া, ক্বাদ্দারা ও ফাহাদা' শব্দ চতুষ্টয় উল্লেখ করেছেন সৃষ্টির পর্যায়গুলো বর্ণনায়।

এ পুরো আলেচনায় পরিষ্কার ফুটে উঠলো যে, আল্লাহই বিজ্ঞানের স্রষ্টা ও কুল মাখলুকাতের স্রষ্টা। তিনি প্রকৃতিকে সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

পরিচ্ছেদ ৯

গুরুমস্তিষ্ক ও পাপ-পুণ্য

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ * نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

"No! If he does not stop, we will take him by the nasyah (forelock), a lying, sinful nasyah (forelock)!"

"কখনই নয়! যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ (নাছিয়াহ) ধরে হেঁচড়াবই- মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ (নাছিয়াহ)!" (আলাক্ব (৯৬): ১৫-১৬)

অত্র আয়াত আল-কুরআনে নাজিল হয়েছে একজন অবিশ্বাসী সম্পর্কে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামকে কাবা প্রাঙ্গণে নামাজ পড়তে বাঁধা দিয়েছিল। প্রশ্ন হলো কেনো কুরআন গুরুমস্তিষ্ক (nasyah, meaning forelock) সম্পর্কে মিথ্যুক এবং পাপী বিশেষণ ব্যবহার করলো? কেনো সরাসরি বলা হলো না যে, লোকটি মিথ্যাবাদী এবং পাপী? মাথার সম্মুখভাগ তথা গুরুমস্তিষ্ক ইংরেজিতে যাকে forelock বা forehead এবং আরবিতে nasyah বলা হয়, এর সাথে মিথ্যা ও পাপের কী সম্পর্ক? Essential of Anatomy and Physiology গ্রন্থে রয়েছে, The motivation and foresight to plan and initiate movements occurs in the anterior portion of the frontal lobes, the prefrontal area. This is a region of association cortex. ঐ গ্রন্থে আরোও আছে, In relation on its involvement in motivation, the prefrontal area is also thought to be the functional center of aggression.

সুতরাং cerebrum এর এই অংশটুকুতে পরিকল্পনা, মোটিভেশন, ভালো বা মন্দ কর্মের উদয় হয়ে থাকে এবং এটি সত্য বা মিথ্যা ভাষণের জন্য দায়ী। ফলে forelock বা naseyah -কে মিথ্যাবাদী এবং পাপী বলে

আখ্যায়িত করা যুক্তিসঙ্গত; যখন কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলে বা পাপ করে- তা করে ঐ উদগত প্রণোদনা থেকে। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন, a lying, sinful nasyah (forelock).।

বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি তথা গত ষাট বছরে গুরুমস্তিষ্কের এই অংশ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, অথচ কুরআন চৌদ্দশত বছর ধরে এই তথ্য ধারণ করে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। কী বিস্ময়কর এই আল-কুরআন! সত্য সত্যই আল-কুরআন ধর্মীয় বিষয়াদির পাশাপাশি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর দলিল।

পরিচ্ছেদ ১০

মেঘমালা, বিদ্যুৎচমক ও শিলা

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ * يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

“Have you not seen that Allah makes the clouds move gently, then joins them together, then makes them into a stacks? - And then you see the rain come out of it. And He sends down hails from mountains [of clouds] in the sky: and He strikes with it whomever He wishes, and He turns it from whomever He wills. The vivid flash of its lightning nearly blinds the sight.”

“তুমি কি দেখ না, আল্লাহই (এ) মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তিনি তাকে (টুকরোগুলোর) সাথে জুড়ে দেন; তারপর স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখেন, অতঃপর একসময় তুমি মেঘের ভেতর থেকে বৃষ্টি বেরিয়ে আসতে দেখবে, (আর দেখবে) আসমানের শিলা স্তর থেকে তিনি শিলা বর্ষণ করেন এবং যার উপর চান তার উপর তা বর্ষণ করেন, (আবার) যাকে চান তাকে তিনি তার (আঘাত) থেকে অব্যাহতিও দেন; মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক (চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়), মনে হয় তা বুঝি দৃষ্টি নিষ্প্রভ করে দিয়ে যাবে।” (নূর (২৪): ৪৩)

বিজ্ঞানীরা মেঘমালা সম্পর্কে যে দীর্ঘ গবেষণা করে চলেছেন, তাতে যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য বেরিয়ে এসেছে সেগুলো আল-কুরআনের এই বাণী সত্যায়ন করেছে সন্দেহাতীতরূপে।

বৃষ্টিদানকারী মেঘমালার মধ্যে এক প্রকার মেঘের নাম Cumulonimbus মেঘ। আবহাওয়া বিজ্ঞানীগণ এই বিশেষ ধরনের মেঘমালা নিয়ে গবেষণা করে কিভাবে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমক সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে অনেককিছু জেনেছেন। তারা দেখতে পেয়েছেন কয়েকটি Cumulonimbus cloud ধাপ পেরিয়ে তবেই বৃষ্টি দেয়। এই ধাপগুলো হলো:

(ক) বায়ুপ্রবাহ মেঘমালাকে চাপ দেয়। বায়ুচাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ এক স্থানে জড়ো হয়ে Cumulonimbus মেঘ সৃষ্টির সূচনা করে।

(খ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ একীভূত হয়ে বড়ো আকার আয়তনের মেঘ তৈরি হয়।

(গ) যখন ক্ষুদ্রাকৃতির মেঘ একত্রিত হয়, তখন স্বাভাবিক বিজ্ঞান অনুসারে বড় আকৃতির মেঘটির অভ্যন্তরে ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে মেঘমালা উপরের দিকে বিস্তৃত হয়ে মেঘস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। একে বলে পঞ্জীভূত হওয়া বা stacking। এই মেঘমালাকে বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত শীতল এলাকায় বিস্তৃত করে, যেখানে জলকণা ও শিলাখণ্ডকে ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, তখনই সেগুলো মেঘমালা থেকে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি আকারে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে।

এই আয়াতে পূর্বালোচিত তিনটি ধাপই পরিষ্কারভবে বর্ণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ সবেমাত্র এই জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, অথচ চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এই বৈজ্ঞানিক বিষয়টি ধারণ করেছে আল-কুরআন।

উপর্যুক্ত আয়াতে মেঘ ও বৃষ্টি সম্পর্কে বলার পর শিলাবৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমক সম্পর্কে বলা হয়েছে- And He sends down hails from mountains [of clouds] in the sky: and He strikes with it whomever He wishes, and He turns it from whomever He wills. The vivid flash of its lightning nearly blinds the sight. (24:43)

এখন আবহাওয়াবিদগণ বলেন, Cumulonimbus cloud যেখান থেকে শিলাবৃষ্টি হয়, ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছায়। অর্থাৎ এই মেঘ পর্বতসমান উঁচু, যেমন কুরআন বলেছে And He sends down hails from mountains [of clouds] in the sky.

উপর্যুক্ত আয়াত একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়- কেনো এই আয়াতে শিলাবৃষ্টির সঙ্গে its lightning কথাটি ব্যবহৃত হলো? এটা কি এই বুঝায় যে, শিলাখণ্ডের পতন বিদ্যুত চমকের জন্য কোনো ফেক্টর? আবহাওয়া বিষয়ে গ্রন্থে রয়েছে যে, যখন শিলাখণ্ড মেঘের অভ্যন্তরে অতি শীতল জলকণা ও বরফকণার মধ্য দিয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়, তখনি এটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যায়। যখন তরল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা শিলাখণ্ডের সাথে ঘর্ষিত হয়, তখন জলকণাগুলো বরফে পরিণত হয় এবং সেগুলো সুপ্ততাপ ছেড়ে দেয়। এভাবে শিলাখণ্ডের বহিস্থ তল আশপাশের বরফখণ্ড থেকে উষ্ণ থাকে। আর অপেক্ষাকৃত শীতল বরফের চাঁই থেকে উষ্ণ শিলাখণ্ডে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়। এভাবে শিলাখণ্ড ঋণাত্মক চার্জ লাভ করে। একই ঘটনায় বরফকণা ধনাত্মক আধান বা চার্জ প্রাপ্ত হয়। ধনাত্মক চার্জ প্রাপ্ত এসব হালকা বরফকণা ঊর্ধ্বচাপের কারণে মেঘমালার উপরাংশে নীত হয়। আর ভারী শিলাখণ্ডগুলো নিচের দিকে ধাবিত হয়। ফলে মেঘের নিচের অংশ ঋণাত্মক ও উপরের দিকটা ধনাত্মক চার্জে চার্জপ্রাপ্ত হয়ে যায়। নিচের ঋণাত্মক আধান স্বাভাবিক নিয়মে ডিসচার্জ হয়ে উপরের দিকে লাফ দিয়ে বিদ্যুচ্চমকের সৃষ্টি করে। সুতরাং এটা বলা যায় যে, শিলা বিদ্যুচ্চমক সৃষ্টির জন্য একটি প্রধান ফেক্টর।

বিদ্যুচ্চমকের এই বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ বিস্ময়করভাবে আল-কুরআনে বিষয়গুলো চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে মওজুদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ১১

তাছখির - ২

اللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

" It is Allah Who has subjected the sea to you, that ships may sail through it by His command, that ye may seek of his Bounty, and that ye may be grateful."

"আল্লাহ তা'আলাই সেই মহান সত্তা, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে রেখেছেন, যাতে করে তোমরা তাঁরই আদেশক্রমে নৌযানসমূহে (আরোহণ করে) তাতে চলতে পারো, এর দ্বারা তোমরা তাঁর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করতে পারো এবং শুকুর আদায় করতে পারো।" (জাসিয়া (৪৫):১২)

ভৌত বিশ্বে আশ্চর্যজনক এক নিয়ম-শৃঙ্খলা রয়েছে এবং এর সৃষ্টিতে রয়েছে এক সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ। ইংরেজিতে একে বলে fine tuning । ৫ম আয়াতের উপর আলোচনাকালে এ ব্যাপারে কিছুটা তথ্য তুলে ধরেছি। এখন এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর আরো কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

কোনো কিছু নির্ধারণ করার সময় এক চূড়ান্ত পরিণতি যা হওয়া উচিত তার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ামক বিষয়গুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করাকে বলে fine tuning বা সুনিপুণ নিয়ন্ত্রণ। জ্যোতির্বিদগণ আবিষ্কার করেছেন যে, এই মহাবিশ্ব, আমাদের ছায়াপথ, সৌরজগত এতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে fine tuning করা হয়েছে যে, এর একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে যে, একজন মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এগুলো তাঁর মহান কর্মকুশলতার মাধ্যমে এতো সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে যে, এই পৃথিবীতে জীবনের উপস্থিতি- বিশেষত্ব মানবের অস্তিত্ব, মহাবিশ্বের নিয়ামক রাশিগুলোর অতিব্যাপক ও অতিসূক্ষ্ম fine tuning এর কারণেই সম্ভব হয়েছে। এ fine tuning না থাকলে মানুষ তো দূরের বিষয়, মহাবিশ্বও

সুশৃঙ্খলতার সাথে যেভাবে আছে সেভাবে থাকতো না। fine tuning এর নজির যা জ্যোতির্বিদ্যায় দেখা যায় তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. মহাকর্ষীয় ধ্রুবক: যেমন আছে তার চেয়ে অতি সামান্য বড়ো হলে নক্ষত্রসমূহ এতো বেশি উত্তপ্ত হয়ে যেতো যে, এরা অতি দ্রুত জীবনকাল নিঃশেষ করে ফেলতো। অতি সামান্য কম হলে, নক্ষত্রসমূহ অতি শীতল থেকে যেতো এবং কোনো ফিউশন বিক্রিয়া হতো না, ফলে কোন ভারী মৌল সৃষ্টি হতো না।

২. ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের অনুপাত: একটু বেশি বা কম হলে রাসায়নিক বন্ধন অসম্ভব হয়ে যেতো।

৩. মহাবিশ্বের প্রসারণের হার: একটু বেশী হলে কোনো গ্যালাক্সি গঠিত হতো না। একটু কম হলে মহাবিশ্বে নক্ষত্র সৃষ্টির পূর্বেই মহাবিশ্ব সংকুচিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো।

৪. আলোর গতি: একটু বেশি হলে নক্ষত্রসমূহ অতি উজ্জ্বল হয়ে পড়তো। একটু কম হলে নক্ষত্রসমূহ অপর্যাপ্ত আলোকসম্পন্ন হতো।

আরো প্রণিধানযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে এই যে, আমাদের ছায়াপথ, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র নিয়ে যে জগত এটিও এমনভাবে fine tuned হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে মানব ও অন্যান্য জীব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে। বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন যে, কেবল একটি বিশেষ নক্ষত্র এবং সে নক্ষত্র থেকে বিশেষ দূরত্বে স্থাপিত বিশেষ একটি গ্রহেই প্রাণধারণের শর্তসমূহ প্রতিপালিত হতে পারে। এ লক্ষ্যে প্রণিত fine tuning-সমূহ দেখুন:

১. মূল নক্ষত্রের বয়স: যদি আরো নবীন বা প্রবীন হতো নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য অতিদ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকতো।

২. মূল নক্ষত্রের রং: যদি আরো লালাভ বা আরো নীলাভ হতো তবে গ্রহে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হতো।

৩. মূল নক্ষত্র থেকে গ্রহটির দূরত্ব: যদি আরো দূর বা আরো নিকটে হতো গ্রহটি, তাহলে এটি অতি উত্তপ্ত বা অতি শীতল হতো। ফলে স্থায়ী পানিচক্র সৃষ্টি হতো না এবং জীবন ধারণ সম্ভব হতো না।

৪. গ্রহটির কক্ষপথের আনতি কোণ: যদি বেশি হতো তবে গ্রহের এক স্থান থেকে অন্য স্থানের তাপমাত্রার ব্যবধান অনেক বেশি হতো, ফলে জীবন ধারণ অসম্ভব হতো।

৫. গ্রহটির ঘূর্ণন গতি: যদি আরো শ্লথ হতো, তবে আহ্নিক তাপমাত্রা ব্যবধান অনেক বেশি হতো, ফলে জীবন ধারণ কঠিন হতো।

৬. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন: যদি পরিমাণে বেশি হতো তাহলে গাছপালা এবং হাইড্রোকার্বন অতি সহজে জ্বলতো। যদি অক্সিজেন পরিমাণ কম হতো তবে উন্নত প্রাণিসমূহের শ্বাস-প্রশ্বাস বাধাগ্রস্ত হতো।

৭. মহাদেশ ও সমুদ্রসংখ্যা অনুপাত: যদি বেশি বা কম হতো তবে প্রাণিবৈচিত্র্য ও জটিল প্রাণ উভয়ই সীমিত হয়ে পড়তো।

উপর্যুক্ত fine tuning এর বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহাকাশ ও পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বা বলা যায়, বাধ্য করা হয়েছে, অনুগত করা হয়েছে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার উপকার লাভের নিমিত্তে। এখানেই পাওয়া যায় আল-কুরআনে বারংবার উল্লেখিত অত্যন্ত পরিষ্কার এক সত্যের সাক্ষাৎ, যাকে বলে ‘তাছখির’। তাছখিরের বাংলা প্রতিশব্দ হলো ‘অনুগত করা’ বা ‘বাধ্য করা’ বা ‘অধীন করে দেওয়া’। ইংরেজিতে হলো ‘to make subject’। এটি এসেছে ‘ছাখখারা’ শব্দ থেকে- যার অর্থ হলো, কোনো কিছুকে কাজে লাগানো, কোনো কিছুকে অন্যকিছুর বাধ্য করে দেওয়া, কোনো কিছুকে অনুগত করা। আল-কুরআনে বর্ণিত তাছখির হলো- আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা’আলা কর্তৃক মহাবিশ্ব ও পৃথিবীকে মানবজাতির উপকারে নিয়োজিত করা, যেনো মানবজাতি আল্লাহর বহুধাবিভক্ত অসংখ্য অনুগ্রহ উপলব্ধি করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অনেকগুলো আয়াতে

তাছখির উল্লেখিত হয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকখানা আয়াতের মূল আরবিসহ তরজমা নিম্নে পেশ করা হলো।

১.

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ * وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন, যিনি জলযানকে তোমাদের অধীন করেছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি নদীসমূহকে তোমাদের অধীন করেছেন। তিনি অধীন করেছেন আবর্তনশীল সূর্য ও চন্দ্রকে এবং তোমাদের অধীন করেছেন রাত ও দিনকে।" (ইব্রাহিম (১৪): ৩২-৩৩)

২.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً * وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

"তোমরা কি দেখনা মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীতে যাকিছু আছে সবই তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথপ্রদর্শক এবং না আছে দীপ্তিমান গ্রন্থ।" (লুকমান (৩১): ২০)

৩.

اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আল্লাহ তো সাগরকে তোমাদের অধীন করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে জলযানসমূহ চলাচল করতে পারে সমুদ্র বক্ষে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়রে জন্যে এতে রয়েছে নিদর্শন।" (জাসিয়া (৪৫): ১২-১৩)

৪.

اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا * ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ * وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ * كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى * يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

"আল্লাহই ঊর্ধ্বাকাশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন, তোমরা তা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করলেন, প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে; তিনি সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রক এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে স্বীয় প্রভুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।" (রাদ (১৩): ২)

মহাবিশ্ব ও পৃথিবীকে মানুষের অধীনস্থ করে দেওয়া বা তাছখির এর ব্যাখ্যা ব্যাপক একটি বিষয়। সংক্ষেপে এর অর্থ এরূপ যে:

১. পৃথিবীর পরিবেশ যা মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের একমাত্র পরিবেশ তা সৃষ্টির জন্য পুরো মহাবিশ্বকে fine tune করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমগ্র মহাবিশ্বের অযুত কোটি গ্যালাক্সি, নক্ষত্র, ইত্যাদির প্রয়োজন কেবল মানুষের

অস্তিত্বের জন্যই ও টিকে থাকার জন্যই। সুতরাং মহাবিশ্ব ও চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীকে fine tuning করে সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষের অস্তিত্ব, জীবন ধারণ ও উপকার লাভ।

২. সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্র ইত্যাদির আলোক ও এদের গতিবিধি মানুষের জীবন যাপনের সহায়ক শক্তি। এই অর্থে এসকল মানুষের অধীন। এসকল যাতে মানুষের উপকার সাধন করতে পারে সেজন্যই এ সকল সৃষ্টিকে fine tune করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩. মানুষ প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল কিছুকেই কাজে লাগাতে পারে। এই অর্থে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু ও বিষয় মানুষের অধীন। এই অধীনস্থতা সৃষ্টি করার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম-নীতিসমূহ fine tune করা হয়েছে।

৪. মানুষ সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও গতিবিধির বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আয়ত্ব করতে পারে ও পারছে। জ্ঞানের নিরিখে মহাবিশ্ব মানুষের আয়ত্বাধীন। এভাবে তাছখির ও fine tuning একই সূত্রে গাঁথা। সুতরাং বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার fine tuning একজন মহাপ্রভু স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, আর আল-কুরআনে বিবৃত তাছখির fine tuning এর সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং আল্লাহর কালাম সত্য বলে প্রমাণিত এবং আল-কুরআনের প্রেরক আল্লাহ মহাজগতের স্রষ্টা হিসেবে প্রমাণিত সত্য।

পরিচ্ছেদ ১২

মহাবিশ্বের সূচনা

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا * وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ * أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

"Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together (as one unit of creation), before we clove them asunder? We made from water every living things. Will they not then believe?"

"যারা কুফরী করে তারা কী দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল (একখণ্ড একক সৃষ্টিরূপে), অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এসব জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?" (আম্বিয়া (২১): ৩০)

মহাবিশ্ব এক বিশাল সৃষ্টি। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ তথা আয়তন এতই অকল্পনীয়রকম বিশাল যে, কল্পনায় শুধু বিস্মিতই হওয়া যায় কিন্তু কল্পনা করা যয় না। এই বিশাল মহাবিশ্বের building block হচ্ছে গ্যালাক্সিসমূহ। একেকটি গ্যালাক্সি এতো বিশাল যে, কল্পনা এখানে মুষড়ে যায়। তবে কিছুটা কল্পনা করা যায় ছোট বা মাঝারি আকারের কিছু গ্যালাক্সির আয়তন। যেমন, আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি সাধারণ নক্ষত্র। এই গ্যালাক্সিতে রয়েছে প্রায় ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র, যার একেকটি আমাদের সূর্যের মতোই। মিল্কিওয়ের আকার অনেকটা একটি চাকতির মতো। এই চাকতির ব্যাস হলো প্রায় দেড় লক্ষ আলোকবর্ষ। এর পুরুত্ব হলো প্রায় ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ। এক আলোকবর্ষ বলতে সেই দূরত্বকে বুঝায় যে দূরত্বে আলোক তার গতিতে ভ্রমণ করতে এক বছর সময়

নেয়। ফলে বলা যায় মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে আলোকরশ্মি সময় নেয় প্রায় দেড় লক্ষ বছর।

এতো বিশাল বিস্তৃত একেকটি গ্যালাক্সি- আর মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি আছে প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি। গ্যালাক্সিসমূহ পরস্পর থেকেও বহু বহু দূরে। সুতরাং পুরো মহাবিশ্বটা অকল্পনীয়রকম বিশাল। আরেকটি কথা হলো গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে ছলছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানী Hubble এর একটি সূত্র আছে। দু'টি গ্যালাক্সির মধ্যকার দূরত্ব যতো বেশি- তাদের পরস্পর থেকে দূরে যাবার গতিবেগও ততো বেশি। মোটকথা, মহাবিশ্বটা সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমশ। তা একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। আর প্রসারণের প্রকৃত হার নিয়ে এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার বলে যে, অতীতে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়েছে ক্রমহ্রাসমান হারে। আর বর্তমানে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে। অর্থাৎ সম্প্রসারণের সাথে যে ত্বরণটি যুক্ত সে ত্বরণ বর্তমানে ধনাত্মক। সুদূর অতীতে এটি ছিলো ঋণাত্মক।

যা হোক, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এখন যদি আমরা মহাবিশ্বের ইতিহাসকে পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে যাই- তবে দেখা যায় মহাবিশ্বটা এক সময় একটি বিন্দু ছিলো। সেই বিন্দুটি একটি অনুপম বিন্দু, যার শক্তি, বল ও বক্রতা ঘনত্ব ছিলো অসীম। অসীম উষ্ণও ছিলো সেই বিন্দুটি। এখন সাধারণ জ্ঞানই বলে, অসীম বস্তু ঘনত্ব ও অসীম উষ্ণ একটি বিন্দু স্থিতাবস্থায় থাকতে পারে না। ফলে মহাবিশ্বের আদি সেই অনুপম বিন্দুটি, যেভাবেই সেটি সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেনো- বিস্ফোরিত হবেই। বিজ্ঞানীরা সুনিশ্চিত যে, তা-ই হয়েছিল।

আজ থেকে প্রায় ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে মহাবিশ্বটা একটি অনুপম বিন্দুর মহাবিস্ফোরণে জন্ম নেয় এবং সৃষ্টি হতে থাকে ধীরে ধীরে নক্ষত্রসমূহ এবং গ্যালাক্সিসমূহ। সেসাথে মহাবিশ্বটা সম্প্রসারিতও হতে থাকে। সুতরাং দুটি বিষয় বলা হলো: ক. যাকে আমরা নভোমণ্ডল বলি আর যাকে আমরা ভূমণ্ডল বলি- এ দুটি এক সময় একই স্থানে মিলিত ছিলো। মহাবিস্ফোরণের পর

ধীরে ধীরে মহাবিশ্বটা এখন যেমন, তেমন হয়েছে। অর্থাৎ এখন আমরা বলি আকাশ ও পৃথিবী। পৃথিবী থেকে এ নামেই মহাবিশ্বকে আমরা চিনি। আমরা পৃথিবীবাসী দেখছি, মহাবিশ্বটা হলো আমাদের পৃথিবী ও আকাশ। অন্যকথায় সহজে বলা যায়- আকাশ ও পৃথিবী একসময় যুক্ত এক পিণ্ড ছিলো, বন্ধ ছিলো, যাকে খুলে দেওয়া হয়েছে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে। এই বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আল্লাহর কালামে উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন: 'যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিলিত ছিলো ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।' (আম্বিয়া : ৩৩)

কী সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক বক্তব্য! আমাদের উপরের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে একেবারে মিলে যায় আল-কুরআনের এই বক্তব্য। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্ব যে সম্প্রসারিত হচ্ছে তারও বর্ণনা আল-কুরআনে বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন, 'আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।' (যারিয়াত: ৪৭)

এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আল্লাহই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি একে সম্প্রসারিত করে চলেছেন। এভাবেই মহাবিশ্বের সূচনা এবং সম্প্রসারণ যা কেবল সম্প্রতি আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক বিষয়, তা চৌদ্দশত বছরের পুরনো কিতাব আল-কুরআনে সরল ও সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। কুরআন নিয়ে গবেষণা করলে তার সত্যতা স্বীকার না করে কোনো জ্ঞানীর পক্ষে সত্যবাদী হওয়া সম্ভব নয়। আর জ্ঞানের এই প্রকাশ অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য মানে আল্লাহ মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও পরিচালক এই জ্ঞান আমাদেরকে দিচ্ছে আল্লাহ অভিমুখী হবার দর্শন ও প্রেরণা।

পরিচ্ছেদ ১৩

পথবিশিষ্ট আকাশ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ

"And by the Heaven full of tracks."

"শপথ পথবিশিষ্ট আকাশের।" (জারিয়াত (৫১): ৭)

মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে সঞ্চরণশীল। কেনো একটি গ্রহ বা নক্ষত্র একটি বিশেষ পথে চলে থাকে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথম আসে আইজাক নিউটনের (১৬৪৩-১৭২৭) মহাকর্ষ সূত্র থেকে। এই সূত্রের মৌলিক বিষয় হলো ফোর্স (force) বা আকর্ষণ বল। একটি ভারী বস্তু অন্য আরেকটি ভারী বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এর সাথে শক্তির নিত্যতা, ঘূর্ণন ভ্রামকের নিত্যতা যোগ হলে গ্রহ-নক্ষত্রের বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে চলার সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। এই নিউটনীয় ব্যাখ্যায় একটা ফাঁক ছিলো। সেটি হলো কেনো একটি বস্তু দূরবর্তী অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করবে? আর কীভাবেই বা সেই আকর্ষণ বল অন্যত্র পৌঁছায়? যদিও এর একটি এডহক ব্যাখ্যা আছে, যা হলো Action-at-a-distance তত্ত্ব; তবে নিউটনীয় এসব ধারণায় সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না বিজ্ঞানী আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫)। আইনস্টাইন Action-at-a-distance তত্ত্ব বাদি দিয়ে মহাকর্ষের জ্যামাতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। তার তত্ত্ব যা General Relativity নামে পরিচিত এমন যে, এখানে force বা আকর্ষণ বলের শরণাপন্ন হতে হয় না- বা Action-at-a-distance তত্ত্বও ব্যবহার করতে হয় না। আইনস্টাইনের তত্ত্বে আছে স্থান-কালের জ্যামিতি। এই তত্ত্বমতে যে কোনো ভারী বস্তু তার চতুর্পাশের স্থান-কালকে প্রভাবিত করে আকাশে একটি বক্র জ্যামিতি সৃষ্টি করে। যেমন, কোনো মাঠে লোক চলাচলের কারণে একটি বা বহু পথরেখা তৈরি হয়- তেমনি কোনো ভারী বস্তুর চারপাশের আকাশ অসংখ্য পথবিশিষ্ট হয়ে যায়। পথগুলো হয় বক্র, কখনো সেগুলো বৃত্তাকার, কখনো উপবৃত্তাকার, কখনো আরো জটিল। মোটকথা, একটি গ্রহ বা নক্ষত্রের

চারপাশের আকাশ পথবিশিষ্ট। অন্য কোনো গ্রহ বা নক্ষত্র প্রথম গ্রহ বা নক্ষত্রটিকে দেখে না, দেখে সে যেখানে আছে সেখানের বক্রতা তাকে কোন দিকে যেতে বলছে; অন্যকথায়, ঐ গ্রহটি বা নক্ষত্রটি পথ দেখে এবং সেই পথে চলে। যে পথটি একটি গ্রহ বা নক্ষত্র বা অন্য কোনো ভারী বস্তুর কারণে সৃষ্টি। তো, সমগ্র মহাকাশের পুরোটাই বক্র জ্যামিতির অধীন এবং পুরো মহাকাশটাই পথবিশিষ্ট। আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্যায়িত। নিউটনের তত্ত্বের মাধ্যমে যেসমস্ত তথ্য বেরিয়ে আসে, আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকেও তেমনি তথ্য বেরোয়- কিন্তু ক্ষেত্রভেদে দুই তত্ত্বের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। তবে এ যাবৎকালের পর্যবেক্ষণে আইনস্টানের তত্ত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অধিক সত্য-নিকটবর্তী পাওয়া গেছে।

ফলে বলা যায়, আইনস্টানের তত্ত্বের একটি সাধারণ প্রতিরূপ নিউটনের তত্ত্ব। অন্যকথায়, যখন মহাকর্ষ শক্তি অনেক শক্তিশালী তখন আইনস্টাইনের তত্ত্ব অধিকতর সত্যের নিকটবর্তী তথ্য দেবে। আর সেসব ক্ষেত্রে নিউটনের তত্ত্ব দেবে আসন্ন মান। অর্থাৎ কম-বেশি শক্তি উভয় ক্ষেত্রে আইনস্টানের তত্ত্ব সঠিক, কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব কম শক্তির মহাকর্ষ ক্ষেত্রে সফলতা পায়। মোটকথা, এখন পর্যন্ত মহাকাশবিদ্যায় আইনস্টাইনের তত্ত্বই সবচেয়ে সফল তত্ত্ব। আর এই তত্ত্বমতে মহাকাশ পথবিশিষ্ট।

এবারে এ সম্পর্কে বিংশ শতাব্দির General Relativity-র সাথে সপ্তম শতাব্দিতে প্রকাশিত আল-কুরআনের বক্তব্যের তুলনামূলক আলোচনায় আসি। আল-কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে অনেক বক্তব্য এসেছে। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক আয়াতটি হলো- “আর শপথ পথবিশিষ্ট আকাশের” (জারিয়াত: ৭) ইংরেজিতে “And by the Heaven full of tracks.”। এই আয়াতের ব্যাখ্যার আর কোনো প্রয়োজন পড়ে না যখন আমরা আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তত্ত্বের সাধরণ জ্ঞানটুকু যা উপরে আলোচিত- জানি। এই আয়াতে কোনো অস্পষ্ট বিষয় নেই। স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, মহাকাশ পথবিশিষ্ট। অর্থাৎ মহাকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে বক্র জ্যামিতি এবং এ কারণে সৃষ্ট পথরেখা, তা আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাতেই বলছে। আল্লাহ তা’আলা বিজ্ঞানের ভাষাই এখানে ব্যবহার করেছেন। আর আধুনিক বিজ্ঞানের ফসল যা এসেছে

বিংশ শতাব্দিতে তা আল্লাহ বলে রেখেছেন সপ্তম শতাব্দিতেই। সুতরাং Hidden Face of Allah আর গোপনীয় নয়, বরং তা প্রকাশ্য। কেবল আমরা দেখছি না সে Face। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছি বহুভাবে, বহুক্ষেত্রে। এভাবে সকল বিষয়ের পেছনেই আল্লাহ রয়েছেন। তাই আল্লাহ বলেন:

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"To Allah belong the east and the West; Wherever you turn your face, there is the Face of Allah, For Allah is all-Pervading, all-Knowing."

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহর সম্মুখ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।" (বাক্বারাহ (২): ১১৫)

পরিচ্ছেদ ১৪

মধুমক্ষিকার ভ্রমণ

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ
ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا * يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"And thy Lord taught the Bee to build its cells in hills, on trees, and in [men's] habitations; Then to eat of all the produce [of the earth], and find with skill the spacious paths of its Lord: there issues from within their bodies a drink of varying colours, wherein is healing for men: verily in this is a Sign for those who give thought."

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'গৃহ নির্মাণ করো পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষের গৃহে; অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহরণ করো, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ করো। তাদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙে পানীয় নির্গত হয়, তাতে মানুষের জন্যে রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।" (নাহল (১৬): ৬৮-৬৯)

আল্লাহর সৃষ্টিরাজির মধ্যে মৌমাছি এক বিশেষ পতঙ্গ। এর রয়েছে এমন মস্তিষ্ক, যার সাহায্যে এরা সূর্যের আলেকরশ্মির পোলারাইজড (মেরুকরণ অবস্থা) ফিল্ড অনুসরণ করতে পারে। আলোকরশ্মি সাধারণত আনপোলারাইজড থাকে। কিন্তু প্রতিফলনের ফলে আনপোলারাইজ রশ্মি কিছুটা পোলারাইজড হয়। পৃথিবীর উপরিতলে প্রতিটি স্থানে আলোকরশ্মির

একটি ফিল্ড তৈরি হয়। এই ফিল্ড প্যাটার্নের মধ্যে দিক থাকে। ঐ দিক চিনে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে মৌমাছির। মৌমাছি পথ চিনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়, সূর্যালোকের ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুসরণ করে। মৌমাছি ছাড়া অন্য প্রাণি বা পতঙ্গের এই গুণ নেই। এই ইলেকট্রিক ফিল্ড অনুসরণ করে চলাচল করার ক্ষমতা দিয়েছেন স্রষ্টা আল্লাহ।

উক্ত আয়াতে আল্লাহর দেওয়া সহজ পথ অনুসরণ করার প্রসঙ্গটি আসছে কেনো? এসেছে এজন্য যে, মৌমাছির পথ অনুসরণ করার বিশেষ ব্যবস্থা- যা উপরে আলোচিত হয়েছে, তা আছে। এই বিশেষ ব্যবস্থা অন্য কোনো প্রাণির বেলায় অনুপস্থিত। মৌমাছির এই বিশেষ গুণের ব্যবস্থা আল্লাহই করেছেন। আর তিনি তা করেছেন বলেই তাঁর কালামে এই প্রসঙ্গটি এনেছেন।

ফলত দুটি বিষয় এখানে পরিস্ফুট হলো। আল্লাহ মৌমাছির জন্য পথ চেনার বিশেষ ব্যবস্থা করেছেন- যে বিশেষ ব্যবস্থার কথা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে কারো জানা ছিলো না। জানা হয়েছে মাত্র গত শতাব্দিতে। তাহলে আল্লাহর এক নিদর্শন মানুষ জানতে পারলো আল-কুরআন নাজিলের বহু শতাব্দি পর ও আরো জানতে পারলো আল্লাহ বিশেষ ঐ যোগ্যতার কথা বহু শতাব্দি পূর্বেই আল-কুরআনে বিবৃত করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল-কুরআন সত্য এবং অলৌকিক। তো আল-কুরআন আল্লাহর বাণী বলে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষ্য রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ যে প্রকৃতির স্রষ্টা তা আল-কুরআনের সত্যতা ও আলৌকিকতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলো। এভাবে আমরা আবারো দেখলাম- প্রকৃতির পেছনে ক্রিয়াশীল আল্লাহর সৃষ্টিক্ষমতা।

পরিচ্ছেদ ১৫

তরঙ্গের উপর তরঙ্গ

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا * وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

"Or [the Unbelievers' state] is like the depths of darkness in a vast deep ocean. It is covered by waves, above which are waves, above which are cloud. Darkness one above another. If a man stretches out his hand, he cannot see it. For any to whom Allah giveth not light, there is no light!"

"অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে, একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই।" (নূর (২৪): ৪০)

গভীর সমুদ্রের আঁধার এই আয়াতে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে এবং সেসাথে দু'প্রকারের তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। সমুদ্রের গভীরের তঙ্গের কথা প্রথমে বলার পর বলা হয়েছে surface wave প্রসঙ্গে।

সমুদ্রের পানির সারফেসে (পৃষ্ঠভাগে) সর্বদা তরঙ্গ আন্দোলিত হতে থাকে। এগুলোকে বলে surface wave। এছাড়া সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, দু'টি ভিন্ন ঘনত্বের পানির স্তরের সংযোগতলে অন্তঃতরঙ্গ বলে এক ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এসব অন্তঃতরঙ্গ সমুদ্রের গভীরে জলস্তরকে সর্বদা আন্দোলিত রাখে, কেননা সমুদ্রের নিচের পানির স্তর উপরের পানির স্তরের

চেয়ে ঘন। ফলে সেখানে সংযোগতল সৃষ্টি হয় অনেক। যেখানেই কোনো সংযোগতল থাকে, সেখানেই তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গগুলো surface wave -এর মতোই, তবে এগুলো মানুষের দৃষ্টির বাইরে থাকে।

সমুদ্রের গভীরের তরঙ্গ সম্পর্কে কেউই জানতো না আল-কুরআন নাযিলকালে। মাত্র সম্প্রতি এসব তরঙ্গ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আসছে। অথচ আল-কুরআন সুস্পষ্টভাবে দু'প্রকারের তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছে চৌদ্দশত বছর পূর্বে। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ নিঃসন্দেহে মহাবিশ্বের স্রষ্টা, আমাদের স্রষ্টা। আমরা কেনো শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করবো না? একজন ঈমানদারের ভাষ্যে আল-কুরআন বলে:

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"And what reason have I that I should not worship Him who has created me, and unto Whom you will be brought back?"

"আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না?" (ইয়া-সীন (৩৬): ২২)

পরিচ্ছেদ ১৬

বিবর্তনবাদ নয়, উপকারবাদ প্রকৃত তত্ত্ব

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً * وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ * كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ

"Then, as for the foam it passes away as scum upon the banks, while that which is for the good of mankind remains in the earth."

"অতঃপর, ফেনাতো বিফলেই চলে যায় যেমন, আবর্জনা (নদীর) কিনারায়, আর যা মানবরাজির জন্য কল্যাণকর তা পৃথিবীতে রয়ে যায়।" (রাদ (১৩): ১৭ অংশ)

এই আয়াত অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে অবতীর্ণ। যা অনুপকারী তা বিলীন হয়ে যায় সহজেই- কিন্তু যা মানুষের জন্য উপকারী তা পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। যেমন, গাছপালা- সেই সুদূরে অতীত থেকে পৃথিবীতে বিদ্যমান থেকে মানুষকে বিবিধ উপকার দিচ্ছে। এ দিয়ে আমরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাই, আর ক্ষতিকর কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নিরাপদ থাকি। গাছপালা দেয় আসবাবপত্রের জন্য কাষ্ঠ, জীবনরক্ষার জন্য ফল-ফলাদি, আরো কতকিছু। শস্যদানার জন্য আমরা সেই সুদূর অতীত থেকে ফসলের উপর নির্ভরশীল এবং তা আজও আমাদের ধান, গম, যব, ভূট্টা যোগান দিচ্ছে। এসবের বীজ সেই সুদূর অতীত থেকে পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। এ সকলকিছু মানুষের জন্য উপকারী বলেই আল্লাহ তা'আলা এসবকে জমিনে স্থায়ী রেখেছেন।

মানুষের কথায় আসা যাক। যেসকল লোক মানুষের উপকার করেন তারা সাধারণত দীর্ঘায়ু হন এবং তাদের সন্তান-সন্তানাদিতে বরকত হয়। নেককার লোকেরাও দীর্ঘায়ু হন। কারণ, তারা মানুষের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত থাকেন।

এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আল্লাহ ঠিকই বলেছেন যে, যা মানুষের জন্য উপকারী তা জমিনে স্থায়ী হয়। হযরত আবুল হাসান আলী নদভী রাহিমাহুল্লাহ (১৯১৪-১৯৯৯) এ থেকে একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যা বিবর্তনবাদকে উড়িয়ে দেয়। বিবর্তনবাদ বলে Survival of the fittest আর অত্র আয়াত বলছে Survival of the beneficial।

যদি তাই হয়- নিশ্চয়ই তাই, বিবরর্তনবাদ একটি মিথ্যা মতবাদ। এমনকি বিবর্তনবাদ অবৈজ্ঞানিক। আল-কুরআন বিবর্তনবাদের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে 'উপকারবাদ' পেশ করেছে।

পৃথিবীব্যাপী অনেক মানুষ আছেন যারা বিবর্তনবাদ কী এবং সেটি কী বৈজ্ঞানিক সত্য- তা জানতে চান। তাই বিবর্তনবাদ যে অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করছি।

১.

বিতর্তনবাদের ভিত্তি নড়বড়ে- বৈজ্ঞানিক তো নয়ই। বর্তমানকালের বিবর্তনবাদীরা একে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে এমন প্রচার প্রপাগান্ডা ও লুকোচুরি খেলছেন। বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ দেয় যে, নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব বিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভবই নয়।

বিবর্তনবাদীরা 'চান্সকে' এক সৃষ্টিশীল দেবতা বানিয়েছে। তাদের মতে সজ্ঞাহীন, চিন্তা-ক্ষমতা রহিত, জড় পরমাণু-অণু, যেমন- ফসফরাস এবং কার্বন বাইচান্স জড়িত হয় একে অপরের সাথে। অতঃপর বিদ্যুৎচমক, আগ্নেয়গিরির উদগীরণ, বিকিরণ রশ্মির প্রভাবে ঐ অণু-পরমাণুগুলো নিজেদেরকে এমনভাবে সজ্জিত করেছে যে, ওরা জটিল অণূ যেমন- প্রোটিন, জৈবকোষ সৃষ্টি করেছে এবং অতঃপর মৎস্য, খরগোশ, সিংহ, পক্ষী, মানুষসহ সকলপ্রকারের জীব সৃষ্টি করেছে। এই তত্ত্বে Chance হলো এক দেবতা, মিথ্যা দেবতা তো বটেই!

২.

বিবর্তনবাদ মতে যেসব জীবিত সত্তা পরিবেশের সাথে সবচেয়ে বেশি খাপ-খাইয়ে নিতে পারে তাদেরই বেঁচে থাকার এবং প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তরের সুযোগ বেশি। ফলে তারা তাদের সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরে সক্ষম হয়। এভাবে প্রজাতিসমূহ বিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিই হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural selection। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই প্রক্রিয়া না পারে জীবনের বিবর্তন ঘটাতে, না পারে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে। অন্যকথায়, খরগোশ যতই চৌকষ হোক এবং এলাকায় সকল খরগোশ যদি এমন চৌকষই থাকে, ওরা বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতি তথা শেয়াল বা কুকুরে পরিণত হতে পারে না। ফলতঃ Natural selection এক ভ্রান্ত ধারণা।

৩.

বিবর্তনবাদের আরেক প্রক্রিয়া হলো Mutation -যাকে সাদামাটা বাংলায় বলা যায়- ‘ভোল পাল্টানো’। এটা ঘটে বাইর থেকে আসা বিকিরণ বা কেমিক্যাল থেকে। বিবর্তনবাদীরা দাবি করেন যে, দৈবচয়নিক মিউটেশন জীবনের বিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো মিউটেশন জীবিত বস্তুর ক্ষতি করে কিন্তু উন্নতি করে না, এবং নতুন কোনো প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য দান করে না। মিউটেশন হয় মৃত্যু ঘটায় বা নষ্ট করে দেয় সেসব জৈববস্তুকে যাতে মিউটেশন হয়। এমন দাবি করা যে, মিউটেশন প্রজাতির উন্নয়ন ঘটায় বা তাদেরকে উন্নততর প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য দান করে, তা এমনই এক দাবি যাতে বলা হয় ভূমিকম্প কোনো শহরকে আরো প্রাগ্রসর ও আধুনিক করতে পারে! বস্তুতঃ মিউটেশনকে আজ পর্যন্ত কোনো জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বৃদ্ধি করতে দেখা যায় নি, উন্নত করা তো দূরের কথা।

৪.

বিবর্তনবাদে দাবি করা হয় যে, অনুন্নত ও সরল প্রজাতি ধীরে ধীরে অগ্রসর ও পরিবর্তন হয়ে এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এ দাবির অব্যবহিত ফলাফল এই যে, বিচ্ছিরি, দানবিক প্রাণি যারা কিনা রূপান্তর মধ্যবর্তী প্রজাতি, সেসব প্রজাতির অস্তিত্ব ছিলো প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে রূপান্তরকালে। উদাহরণতঃ অর্ধেক-মৎস্য, অর্ধেক উভচর প্রাণির অস্তিত্ব ঐ দাবির অনিবার্য পরিণতি। যদি এমন রূপান্ত-মধ্যবর্তী প্রজাতি কোনোকালে অস্তিত্বে ছিল বলে দাবি করা হয়, তবে তাদের অবশেষ নিশ্চয়ই ফসিল রেকর্ডে থাকতো। কিন্তু শতাব্দিকালব্যাপী এমন প্রাণপণ খোঁজাখুঁজির পরও এমন রূপান্তর-মাধ্যমিক প্রজাতির ফসিল পাওয়া যায় নি। বিবর্তনবাদের জন্য আফসোস!

৫.

প্রায় সকল জীবিত প্রজাতি আজ থেকে ৫৩০ থেকে ৫২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে ক্যামব্রিয়ান যুগে হঠাৎ করেই একই সাথে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমানে জীবিত সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হঠাৎ করেই একই সময়ে আবির্ভূত হয়েছে- যেসব প্রজাতির দূরসম্পর্কীয় কোনো প্রজাতির দেখা মেলেনি ক্যামব্রিয়ান পূর্ববর্তী যুগে। এই ঘটনাটি বিবর্তনবাদীদের দাবি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়- যে দাবিটি হলো সকল প্রাণসম্পন্ন বস্তু একটি সর্বজনীন পূর্বপুরুষ থেকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে বহুকালে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছে। ক্যামব্রিয়ান যুগে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির একই সঙ্গে আবির্ভাব এটাই প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই এরা সৃষ্ট- এক সৃষ্টিকর্তার দ্বারা। যেহেতু বিবর্তনবাদীরা সৃষ্টিকে অস্বীকার করে এবং অস্বীকার করে একজন স্রষ্টাকে, তারা এই ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণকে ব্যাখ্যা করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

৬.

যদি সত্যিই বিবর্তন ঘটে থাকে যাতেকরে প্রাণিসমূহ আবির্ভূত হয় সামান্য সামান্য অগ্রসরমান পরিবর্তন থেকে, তবে এই পরিবর্তন চলমান থাকার কথা। কিন্তু ফসিল রেকর্ড এর বিপরীত কথা বলে। ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি হঠাৎ করেই আবির্ভূত হয়েছে, যার কোনো পূর্বপুরুষ দূরবর্তীভাবেও এসকল প্রজাতির ন্যায় নয়। ক্যামব্রিয়ান যুগে আবির্ভূত প্রজাতিসমূহ এখনপর্যন্ত শত শত মিলিয়ন বছর ধরে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও স্থায়ীরূপে বর্তমান রয়েছে, কোনো পরিবর্তন আদৌ হয় নি।

এই আলোচনায় এটা স্পষ্ট হলো যে, বিবর্তনবাদ এক কাল্পনিক গল্পগাঁথা যার কোনো বাস্তবতা নেই। সুতরাং বলা যায়, বিবর্তনবাদ নয় বরং উপকারবাদ হলো প্রকৃত তত্ত্ব যা আল-কুরআন ১৪০০ বছর পূর্বে ঘোষণা করেছে।

পরিচ্ছেদ ১৭

Quantum Entanglement

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Glory to Allah, Who created in pairs all things that the earth produces, as well as their own [human] kind and [other] things of which they have no knowledge."

"পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, (চাই তা) জমিন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ থেকে হোক, কিংবা (হোক) স্বয়ং তাদের নিজেদের থেকে, অথবা এমনসব সৃষ্টি থেকে হোক, যাদের (সম্পর্কে) মানুষ (এখনো) আদৌ (কিছুই) জানেই না।" (ইয়া-সীন (৩৬): ৩৬)

যখন একজোড়া বা ততোধিক সাব-এটমিক কণা তৈরি করা হয় এমনভাবে যে প্রত্যেক কণার কোয়ান্টাম অবস্থা অন্য একটি বা সকলের কোয়ান্টাম অবস্থা থেকে পৃথক করা যায় না, এমনকি যদি ওরা বহু দূরেও চলে যায়। এটাকে বলে Quantum Entanglement -কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট।

সাধারণ দু'টি কণা দিয়ে এই এনটেঙ্গেলমেন্ট করা হয়। উদাহরণতঃ ধরা যাক একটি সাব-এটমিক কণা ক্ষয় হয়ে একজোড়া এনটেঙ্গেল নতুন কণা তৈরি হলো। সুনির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায় একটি স্পিন-যিরো কণা ক্ষয় হয়ে একজোড়া স্পিন-হাফ কণা তৈরি হলো।

যেহেতু ক্ষয়ের পূর্বের ও পরের স্পিন সমান হতে হবে, যখন একটি কণার স্পিন কোনো এক্সিস এর সাপেক্ষে স্পিন-আপ হয়, তখন অন্য কণাটির স্পিন অবশ্যই ডাউন পাওয়া যাবে ঐ এক্সিসের সাপেক্ষে। যদি এনটেঙ্গেল জোড়ার একটি পৃথিবীতে থাকে আর একটি চন্দ্রে থাকে, তবুও উপরোক্তরূপে অপরিবর্তিতরূপে পাওয়া যাবে।

এই হলো জোড়ার উদাহরণ যা সাব-এটমিক কণাদের মাঝে পাওয়া যায়। আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন এমনসব বস্তুর জোড়া তিনি তৈরি করেন যা মানুষ (তখন) আদৌ কিছুই জানতো না। আজ এতকাল পরে এসে আমরা কেয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জোড়ার সন্ধান পেয়েছি। ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিক্বিন।

পরিচ্ছেদ ১৮

পৃথিবীর ঘূর্ণন ও ঘূর্ণনদিক

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ * صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ * إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

"You will see the mountain and reckon them to be fixed; but they go past like the clouds- the handiwork of Allah Who gives to everything perfect order: for He is well acquainted with all that you do."

"তুমি দেখবে পাহাড়কে যেনো তা অনড়; কিন্তু না- ওরা সরে যায় মেঘমালার মতো- আল্লাহর নৈপুণ্যে; যিনি প্রত্যেক জিনিষ মজবুত করে বানিয়ে রেখেছেন; তোমরা যা করছো অবশ্যই তিনি সেসব ব্যাপার সম্যক অবগত আছেন।" (নামল (২৭): ৮৮)

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী কেবল ঘূর্ণায়মানই নয় বরং এর একটি ঘূর্ণন দিকও রয়েছে। ৩,৫০০-৪০,০০০ মিটার উর্ধ্বের প্রধান মেঘমালার চলাচলের দিক হলো পশ্চিম থেকে পূর্বে। মেঘমালা যে কারণে পশ্চিম থেকে পূর্বে ভ্রমণ করে তাহলো পৃথিবী এই দিকেই ঘূর্ণমান। আমরা বর্তমানে জানি, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘূর্ণমান। এই বৈজ্ঞানিক তথ্য মাত্র সেদিন বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে- অথচ আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে আল-কুরআনে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যখন মনে করা হতো পৃথিবীটা সমতল।

পরিচ্ছেদ ১৯

আকাশের সাত স্তর

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ * وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا

"It is He Who created everything on earth for you and then directed His attention up to the heaven and arranged it into seven regular heavens. He has knowledge of all things."

"In two days He determined them as seven heavens and revealed, in every heaven, its own mandate."

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছু সম্পর্কেই সম্যক অবগত।" (বাক্বারাহ (২): ২৯)

"(পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার) একই সময়ে তিনি দু'দিনের ভেতর (বিশ্বব্যাপী ধূর্মকুণ্ডকে) সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তাঁর আদেশনামা পাঠালেন।" (হা-মীম-সিজদাহ (৪১): ১২)

এই দু'আয়াতে উল্লেখিত 'heaven' (السَّمَاءِ) শব্দটি অন্য আরো অনেক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে এবং এটি যেমন পৃথিবীর উপরিস্থ আকাশকে বর্ণনা করে, তেমনি করে সমগ্র মহাবিশ্বকে। এই অর্থ নিলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর উপরস্থ আকাশ যাকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়, তা সাতটি স্তরে বিন্যস্ত। একের

উপর আরেকটি এভাবে সাতটি স্তরে বিন্যস্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ রাসায়নিক দিক দিয়ে বা তাপমাত্রার দিক দিয়ে বিভক্ত।

আধুনিক জিওলজি মুতাবিক এই সাতটি স্তর হচ্ছে এমন:

১) ট্রপোস্ফেয়ার

২) স্ট্রাটোস্ফেয়ার

৩) মেসোস্ফেয়ার

৪) থার্মোস্ফেয়ার

৫) এক্সোস্ফেয়ার

৬) আয়নোস্ফেয়ার

৭) মেগনেটোস্ফেয়ার

প্রত্যেকটি আকাশে তাঁর আদেশনামা পাঠানো বলতে আল্লাহ্ বুঝিয়েছেন যে, তিনি প্রত্যেক আকাশকে বা স্তরকে তার জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সত্য-সত্যই বায়ুমণ্ডলের প্রত্যেকটি স্তর মানবজাতি ও অপরাপর পৃথিবীবাসীর উপকারার্থে এক বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পরিচ্ছেদ ২০

অতীতও পরিবর্তনযোগ্য

يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ * وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

“Allah blots out or confirms what He pleases: with Him is the Mother of the Book.”

“আল্লাহ তা’আলা যা কিছু চান তা বাতিল করে দেন এবং যা কিছু ইচ্ছা করেন তা বহাল রেখে দেন: মূল গ্রন্থ তো তাঁর কাছেই মজুদ।” (রাদ (১৩): ৩৯)

এই আয়াতের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরুর পূর্বে অন্য একটি ভৌত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যয়- যার শিরোনাম “যা অতীত তা-ও পরিবর্তনযোগ্য”।

সাধারণতঃ সকলেই বলেন ও নিশ্চিত বিশ্বাস রাখেন যে, যা ঘটে গেছে বা অতীত- তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। কিছুতেই রেকর্ড থেকে ঘটিত ঘটনা মুছে ফেলা সম্ভব নয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে অনেক জানা ও ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

বস্তুতঃ পদার্থবিজ্ঞানের আওতায় কোনোদিন কেউ ভাবেও নি যে, বস্তুকণা বা যে কোনো ভৌতকাঠামো যে ইতিহাস রচনা করে তার স্থিতি ও গতির কার্যক্রমে- তা কোনোভাবে পরিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু বিংশ শতাব্দির শেষ প্রান্তে এসে কিছু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ভাবলেন ও দেখলেন যে, কোয়ান্টাম বিশ্বে বস্তুকণা একবার যে পথ ধরে চলে তার রেকর্ড হয়ে যাবার পর- ভবিষ্যতে তার পথে কোনো বিচ্যুতকারী থাকার কারণে- সে ভবিষ্যতে যে পথ ধরবে তার জন্য তার প্রয়োজনীয় অতিতের সংশোধন করে নেয়- ফলে ভবিষ্যতের পথ পুনঃনির্ধারিত হয়।

আরো স্পষ্ট করে বলি, ধরুন একটি ইলেকট্রন একটি পরীক্ষণীয় সেটআপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তার প্রাথমিক পথ নির্ধারণ করবে- সামনে সে কোন পথে যাবে। এখন তার গমনপথে একটি যন্ত্র বা এ ধরনের কিছু রাখা হলো- ফলে

সামনে তাকে পূর্বনির্ধারিত ট্র্যাক ছেড়ে দিয়ে অন্য পথে যেতে হবে। কিন্তু তার অতীত রেকর্ড বলছে, সে ঐ পরিবর্তিত পথ ধরার শর্ত পূরণ করে না। ফলে সে ট্র্যাক বদলাতে পারবে না। কিন্তু ট্র্যাক তাকে বদলাতে হবেই। তখন কী হয়? ইলেকট্রনটি তার অতীত রেকর্ড বদলে ফেলে! অতীত সংশোধন করে ভবিষ্যতে তাকে যে পথে যেতে হবে- সেই পথে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করে নেয়। এভাবে ইলেকট্রনের যে রেকর্ড ছিলো, সেই রেকর্ড রেজিস্টার হয়ে যাবার পরও বদলে যায়।

স্থান-কাল ও ডিটেক্টরে যে অতীত ছিলো সেই বাস্তব অতীত মুছে গিয়ে নতুন করে লেখা হয় অন্য এক অতীত। ফলে ভবিষ্যতের পথে ইলেকট্রনটি নির্ধারিত এক ট্র্যাকের পরিবর্তে- পরিবর্তিত শর্তের কারণে অন্য ট্র্যাকে চলতে থাকে। এ হলো শর্ত সাপেক্ষে অতীত মুছে যাওয়া।

ইলেকট্রন বা মৌলিক কণা নিয়ে এমন ধরনের কোয়ান্টাম ঘটনা দর্শনের যে পরীক্ষাগুলো করা হয়- সেগুলোকে বলে - delayed choice experiment।

এবারে মানবজীবনে এমন ধরনের ঘটনার একটি উদাহরণ দেবো যা অত্যন্ত উচ্চ মার্গের ভাবনা-চিন্তার বিষয়। আল্লাহ তা'আলা জগতসৃষ্টির পূর্বে কলম সৃষ্টি করে বলেন, লেখো। কলম বলে, কী লিখবো? আল্লাহ বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত যা ঘটবে সবই লিখো। যা হোক- মূল কথা হলো, মানুষ বলি, ভৌত জগত বলি- সবার ক্ষেত্রে যা ঘটার তা আল্লাহ লিখে রেখেছেন। একে তাকদির বলা হয়। কিন্তু হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমরা জানি- লিখিত সেই তাকদির বদলে যায়। আল্লাহ তা'আলাও মানুষকে বলেছেন, তাওবাকারীর অতীত পাপের বদলে নেকি লিখে দেবেন।

তাকদির বদলে যাবার এই কথাটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতে ঘটিতব্য ঘটনার জন্য অতীতে তাঁর লিখিত ভাগ্যলিপিতে সংশোধন আনেন। এমন নয় যে, আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির মূল্যহীন। না, বরং মানুষ ও ভৌত বিশ্বের উপাদানের জন্য যা নির্ধারিত তা-ই ঘটবে। নির্ধারিত অতীত রেকর্ড যা আছে তাই ঘটবে। কিন্তু মানুষ ও ভৌত বস্তুর কর্মকাণ্ড, শর্তাদি

ভবিষ্যতে যে রেকর্ড রাখতে চায়, তার সঙ্কুলান ঐ অতীত রেকর্ডে রয়েছে। এমনভাবে যে, অতীতের সেই রেকর্ডের কিছু উপাদান মুছে যাবে যেনো পূর্ব থেকেই তা-ই ছিলো। অথচ তা ছিলো না! বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, অতীতের সাথে এমনভাবে জড়িত আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হাতে যে, অতীত অতীত নয়, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ নয়।

সবই আল্লাহর কাছে মজুদ বা বর্তমান। মানুষের কর্মকাণ্ড তার অতীত সংশোধন করে ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করে। আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণের বাইরে পা ফেলার সুযোগ থাকে না- তবুও এসব হয়।

এখানে দুটো পারস্পেকটিভ বা দৃষ্টিকোণ। আল্লাহ তা'আলার কুদরত শক্তিশালী তাকদির বা নির্ধারণ- কিন্তু মানুষও তার কর্মকাণ্ডের জন্য স্বাবলম্বী। মানুষ বলতে পারে না যে, সে ছিলো অসহায় ও গায়ের ইখতিয়ার। হ্যাঁ, মানুষের সবকিছু ইখতিয়ারী নয়। কিন্তু ইখতিয়ারী বিষয়ও অনেক এবং সেই ইখতিয়ারী বিষয়ের জন্যই সে দায়ী। যে গায়র-ইখতিয়ারী বিষয়ে সে অসহায়, সেগুলোর জন্য সে দায়ী নয়। মানুষ প্রশ্নের মুখোমুখি তার ইখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে। আর সেসব বিষয়ে অতীত রেকর্ড সংশোধন করে সুন্দর ও সঠিক ভবিষ্যৎ নির্মাণও তার ইখতিয়ারভুক্ত। সে সকল নির্ধারণ অপরিবর্তনীয় তার জন্য মানুষ প্রশ্নের মুখোমুখি হবে না। সেগুলো সম্পূর্ণই আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়।

সামগ্রিকভাবে আল্লাহর অভিপ্রায় প্রতিটি মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের অনুকূলে। মানুষের অভিপ্রায় সেই অভিপ্রায়ের সাথে মিলে গেলে, মানুষ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়। আর যদি মানুষের অভিপ্রায় আল্লাহর সার্বজনীন অভিপ্রায়ের অনুকূলে না আসে- তবে বলতে হবে, তার জন্য নির্ধারিত অকল্যাণকে সে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে- এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারণ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। মানুষ তখন দোষণীয় কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ ন্যায়ের ফায়সালাকারীই থাকবেন।

পরিচ্ছেদ ২১

জড়জগত অদৃশ্যনির্ভর

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

"Who believe in the Unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what We have provided for them."

"যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখে, যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদের আমি যা কিছু দান করেছি তারা তা থেকে (নির্দেশিত পথে) ব্যয় করে।" (বাক্বারাহ (২): ৩)

এই আয়াতের মূল বিষয় হলো অদৃশ্যের ওপর ঈমান। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা একটু ভিন্নভাবে প্রবাহিত করে আমরা দেখবো, "অদৃশ্যই দৃশ্যমানের আবাসস্থল"।

বেশ কয়েক শতাব্দি পেরিয়ে যাচ্ছে আপাতঃবুদ্ধিমানের একগুঁয়েমিপূর্ণ ঐ মনোভাব নিয়ে যে, যা কিছু দৃশ্যমান, অনুভবনীয় ও পরিমাপযোগ্য তার বাইরে কিছু নেই। তথা জড়বস্তু ও জড়তার বাইরে কোনো আত্মা বা অদৃশ্য পাশ্চাত্য প্রভাবিত বুদ্ধিজীবীগণ বিশ্বাস করেন নি এবং করতে দেনও নি। যদিও এখন পাশ্চাত্য পিছিয়ে যাচ্ছে সেই একগুঁয়েমি থেকে- প্রাচ্যের পিছিয়ে থাকা মফস্বলীয় বুদ্ধিজীবীগণ এখনো সেই বস্তুবাদের পূজা করে যাচ্ছেন। আমাদের ওপর চেপে বসে আছেন যেনো, আমরা আত্মা আর অদৃশ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো কথা প্রচার করতে না পারি। এমতাবস্থায় আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে- জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলন কোনো গোষ্ঠির একগুঁয়েমির কারণে থেমে থাকে না এবং সত্য বেরিয়ে আসেই এবং মিথ্যা অপসারিত হয়ই।

কোয়ান্টাম বিজ্ঞান আবিষ্কারের পরই, সাত-আট দশক পেরিয়ে যাবার পর এখন আমরা জানি, মৌলিক কোয়ান্টাম কণারা অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের মাঝে ভেসে বেড়ায়। যখন কোনো কোয়ান্টাম কণাকে দেখার বা পরিমাপের চেষ্টা করা না হয়- তখন সেই কণাটি কোথাও অবস্থান করে না। সেটি সম্পূর্ণ

সম্ভাবনার অদৃশ্য জগতে অবস্থান করে। যখনই পরিমাপের বা দেখার উদ্যোগ নেওয়া হয় তখনই কেবল সেটিকে দেখা যায় বা সেটি তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই এ্যারিস্টটল বলেন, "All things produced either by nature or by art have matter; for each of them is capable both of being and of not being and this capacity is the matter in each" অন্য এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "One element is matter and another is form, one is potentially and the other actually." [এ উদ্ধৃতিটি ইতোমধ্যে ৭ নং পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছি- এখানে সঙ্গত কারণেই পুনরায় উদ্ধৃত করলাম।]

নিউটনীয় চিন্তাধারা থেকে বহুদূরের এই এ্যারিস্টটলীয় ধারণা। বর্তমানকালের কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ধারণাগুলোর সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে সুদূর অতীত আর বর্তমান মিলে গিয়ে- আমরা স্পর্শ আর অনুভবের বস্তুবাদ থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য আর দৃশ্যের পারস্পরিক জগতে পুনরায় পদার্পণ করছি।

আর চৌদ্দশত বছর পূর্বে আল-কুরআন আমাদেরকে বলছে- অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে। বলা হয়েছে: "আলিফ-লাম-মীম। এই সে কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের দিশারী। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী।"

মূলতঃ জগতের বস্তুসমূহের দৃশ্যমান অস্তিত্ব নিরবচ্ছিন্ন নয়। আমাদের দেখা ও অনুভবের ক্ষমতা যদিও বিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর যুক্ত, তবুও মনে হয় যেনো তা নিরবচ্ছিন্ন। ফলে যা আমরা দেখি তাকেও মনে হয় নিরবচ্ছিন্ন। কিন্তু জগৎ নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ববান নয়। বরং সকল বস্তুই অদৃশ্য আর দৃশ্যের মাঝে দোলায়মান। এমনকি অদৃশ্যই প্রভাবে প্রধান। বস্তুতঃ অদৃশ্যই দৃশ্যমানের আবাসস্থল।

এজন্যই আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যে বিশ্বাসের আহ্বান করেছেন। মুত্তাকীরা যারা আল্লাহ সচেতন তারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসের বেলায় যে অদৃশ্যের আমদানী তা নয়। বস্তুজগতই অদৃশ্যনির্ভর। কথাগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করলাম- পাঠকের আরো ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২২

জড়বস্তু জড় নয়

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

“We said, 'O fire! You be cool, and be (a means) of safety for Ibrahim.”

“আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও শান্তিময় হয়ে যাও।” (আম্বিয়া (২১): ৬৯)

এই আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য হলো- ‘জড় বস্তু জড় নয়’। সামনের আলোচনা এই বিষয়টিকে পরিস্ফুট করবে।

এই একবিংশ শতাব্দিতে আধুনিক মানুষ সকল মনোযোগ এবং গুরুত্ব প্রদান করছে বিজ্ঞানে। সব ধ্যান-ধারণার উৎসে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে বিজ্ঞানকে। কিন্তু বিজ্ঞান কি সকল রহস্যের সমাধানে সক্ষম? আর কোন্ বিজ্ঞান আমরা মানবো- নিউটনীয় না সর্বাধুনিক কোয়ান্টাম বিজ্ঞান? কোয়ান্টাম বিজ্ঞান যেভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং দিনে দিনে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার দারস্থ করছে আমাদেরকে- তা কি মফস্বলের বুদ্ধিজীবীর বোধগম্য? অথচ মফস্বলের বুদ্ধিজীবী বিজ্ঞানমনস্ক হবার সবক দিয়ে চলেছেন তার সকল শাগরিদকে। তিনি কোন্ বিজ্ঞান জানেন বা বুঝেন?

নিউটনীয় বিজ্ঞান বিশ্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যার মধ্যে বস্তু এবং স্থান-কাল ছাড়া কিছুই থাকে না। গতি আর শক্তি ছাড়া নিউটনীয় বিশ্ববীক্ষায় আর কিছু নেই। কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে সেই গতি আর শক্তির বাইরে বিশাল এক জগত আবিষ্কৃত হয়েছে- যা বুঝা মফস্বলের বুদ্ধিজীবীর জন্য শত বছরের সাধনার বিষয়। কোয়ান্টাম বিজ্ঞান আমাদেরকে গ্রিক দার্শনিক এবং মুসলিম ইমামদের নিকটবর্তী করে দিয়েছে যা হয়তো বা মফস্বলের বুদ্ধিজীবীর কখনোই মনঃপুত হবে না। কারণ তিনি বস্তু আর গতির মার্কসীয় দর্শনের বাইরে যাবার মানসিক শক্তি ধারণ করেন না।

যাক, গ্রিক দার্শনিকগণ মহাবিশ্বকে আত্মাবিশিষ্ট এবং জীবন্ত বলে সনাক্ত করেছিলেন। জড় অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে এক বিশেষ জীবন্ত প্রক্রিয়া সকল বস্তুতে এবং সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্বকে ঘিরে আছে বলে তারা মনে করতেন। সর্বাধুনিক কোয়ান্টাম বিজ্ঞান পুনরায় সেই ধারণাকে আকড়ে ধরতে চাচ্ছে। মৌলিক বস্তুকণা যেভাবে আচরণ করে তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত কঠিন এবং সেই কঠিন কাজটি গত একশত বছরে কিছুটা আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে মৌলিক বস্তুকণা তথা এটম এমনভাবে আচরণ করে, যেনো তার একটি 'মন' আছে। পদার্থবিজ্ঞানী Freeman Dyson (১৯২৩-১৯২০) বলেন: " It appears that mind, as manifested by their capacity to make choices, is to some extent inherent in every atom ..."

যার মন আছে- সে কী জীবন্ত নয়? তাহলে জড়বস্তু জড় রইলো কী করে? সকল বস্তুই তাই বলা যায় জীবন্ত এবং সামগ্রিকভাবে মহাবিশ্ব জীবন্ত। তাইতো আমরা দেখি, আল-কুরআনে কিছু আয়াত রয়েছে যা বুঝতে এবং হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হতো- কেননা সেখানে কখনো ইঙ্গিত এবং কখনো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়বস্তু প্রাণহীন নয়। মুসলিম ইতিহাসেও এমন সব বর্ণনা রয়েছে সেখানে স্পষ্ট হয়েছে যে, জড় বস্তুও প্রাণসম্পন্ন।

প্রথমেই উল্লেখ করবো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে একটি ঘটনা। মদিনার মসজিদে নববীতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমদিকে যখন মিম্বর নির্মিত হয় নি- তখন একটি খেজুর বৃক্ষের কাষ্ঠখণ্ডে হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর যখন মিম্বর প্রস্তুত হলো এবং সেই কাষ্ঠখণ্ডটি পরিত্যক্ত হলো এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর ব্যবহার শুরু করলেন, তখন সেই কাষ্ঠখণ্ডটি যার নাম ছিলো যি-সালাম, সুস্পষ্ট স্বরে ক্রন্দন করতে থাকে। মসজিদে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম রিদ্বওয়ানুল্লাহি তা'আলা আজমাঈন যি-সালামের সেই কান্না স্পষ্টভাবে শুনেছেন। এরপর রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বর থেকে নেমে এটিকে বুলিয়ে দিলেন- যেমনটি কোনো

শিশুকে সান্ত্বনা দিতে মাথা বুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপর কাষ্ঠখণ্ডটি তার কান্না থামায়। সহীহ্ বুখারিতে বর্ণিত এ ঘটনাটি ইতিহাসে মশহুর ও প্রমাণিত।

আলোচ্য আয়াত ছাড়াও আল-কুরআনের সূরা আহযাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ * إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

"Verily, We offered the Trust to the Heavens and the Earth and the Mountains; but they refused to bear it, and were afraid of it: but man bore it;- Indeed, he (man) is unjust and neglectful."

"আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত পেশ করেছিলাম। ওরা একে বহন করতে অস্বীকার করলো এবং এতে শঙ্কিত হলো, কিন্তু মানুষ একে বহন করলো; সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ।" (আহযাব (৩৩): ৭২)

এছাড়া সূরা আম্বিয়ায় ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের ওপর আগুনকে শীতল হওয়ার নির্দেশ দানের পূর্বের তিনটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ * أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ * أَفَلَا تَعْقِلُونَ *قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

"তিনি (ইব্রাহিম আ.) বললেন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করো যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না?' ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করো তাদেরকে! তবু কি তোমরা বুঝবে না। তারা বললো, একে

(ইব্রাহিমকে) পুড়িয়ে ফেলো, সাহায্য করো তোমাদের দেবতাদেরকে, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।” (আম্বিয়া (২১): ৬৬-৬৮)

উপরের প্রথম (সূরা আহযাবের) আয়াতের উদ্ধৃতি থেকে আসমান, যমিন এবং পর্বতমালার যে বুঝ জ্ঞান রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। দ্বিতীয় (উপরোক্ত আম্বিয়ার ৬৬-৬৮) উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রাণ থাকলে তার কোনো নিজস্ব ইচ্ছাক্ষমতা নেই। সুতরাং এগুলোর উপাসনা করাও বাতুলতা। আর হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের ওপর আগুন শীতল হওয়ার আমাদের আলোচ্য আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, আগুণও বুঝমান।

আল্লাহ তা’আলার এই সকল বাণীর সত্যতা কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কার- যা উপরে উল্লেখ করেছি, নতুন করে উপলব্ধিতে আনলো। আমরা মুসলমানরা কোনো দিনই আল্লাহর বাণী এতটুকু সন্দেহের চোখে দেখি নাই, কিন্তু বর্তমান মফস্বলের বুদ্ধিজীবীদের অত্যাচারে বাধ্য হয়ে এই ক’টি কথা লিখলাম।

জড়বস্তু জড় নয়। আল্লাহর বাণীতে সন্দেহের কোনো লেশমাত্র নেই। তবুও কোথায় ঘোরাফেরা করছেন?

পরিচ্ছেদ ২৩

চাঁদের কক্ষপথ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ * وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

"And We have decreed set phases for the Moon, until it ends up looking like an old date branch. It is nor for the Sun to overtake the Moon nor for the night to outstrip the day; each one is swimming in a sphere."

"চাঁদ, তার জন্য আমি বিভিন্ন দশা নির্ধারণ করেছি, যাবৎ না এটি এমন হয়ে পড়ে যেনো তা পুরনো খেজুরের একটি (পাতলা) ডাল। সূর্যের এ ক্ষমতা নেই, সে চাঁদকে নাগালের মাঝে পাবে- না রাত দিনকে ডিঙ্গিয়ে আগে চলে যেতে পারে; এবং প্রত্যেকেই গোলাকার পথে সাঁতার কেটে চলেছে।" (ইয়া-সীন (৩৬): ৩৯-৪০)

চাঁদ কেনো সমতাপূর্ণ কক্ষপথে ঘুরে না, যদিও অন্য অনেক উপগ্রহ তাদের গ্রহের কক্ষপথে সমতাপূর্ণ পথ পরিভ্রমণ করে। চাঁদ যখন পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে তখন এটি কখনো পৃথিবীর সামনে চলে যায়, আবার কখনো পেছনে পড়ে যায়। আর যেহেতু পৃথিবীর সাথে একসঙ্গে এটি সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করে, এর কক্ষপথ আকাশে ইংরেজি S অক্ষরের মতো। চাঁদের এই সামগ্রিক কক্ষপথকেই অত্র আয়াতে পুরনো খেজুরের ডাল, যা সাধারণত বাঁকা, বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুতই, আয়াতে উদ্ধৃত 'উরজুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয় শুকনো, পাতলা ও বাঁকা খেজুর ডাল বুঝাতে। যেমনভাবে এখানে খেজুর ডালকে পুরনো বলে উল্লেখ করা হয়েছে- তাতে এটি আরো বেশি পাতলা ও বেশি বাঁকা বলে প্রতীয়মান হয়।

সন্দেহ নেই যে, আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে চাঁদের উপরোল্লিখিত S আকৃতির কক্ষপথ সম্পর্কে কারো ধারণা ছিলো না। চাঁদের কক্ষপথ সর্বাধুনিক আবিষ্কার এবং এর উল্লেখ ১৪০০ বছর পূর্বে আল-কুরআনে মিলছে। এটি আবারো আল-কুরআনের অলৌকিকতা প্রমাণ করে।

পরিচ্ছেদ ২৪

‘কুন ফায়াকুন’

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Verily, His command, when He intends a thing, is only that He says it to, 'Be', and it is.”

“তিনি যখন কিছু একটা করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল এটুকুই বলেন, ‘হও’- অতঃপর তা সাথে সাথে হয়ে যায়।” (ইয়া-সীন (৩৬): ৮২)

আল্লাহ্‌ তা’আলার কার্য, সাধারণতঃ বিলা সাবাব। অর্থাৎ কোনো উপকরণ প্রয়োজন পড়ে না আল্লাহর। যখন কোনো কিছুর ইরাদা করেন তিনি, তখন শুধু বলেন, ‘হও’, অমনি সেটি হয়ে যায়।

এখানে কার্যকারণ বা Cause and effect এর কোনো ভূমিকা নেই।

বস্তুবিশ্বে সকল ঘটনা কারণ দ্বারা উদ্ভূত হয়। Cause বা কারণ সাধারণত আগে, পরে তার ফলাফল বা Effect দেখা যায়। সব বস্তুই বা তথ্য একটি সর্বোচ্চ বেগ তথা আলোর বেগের সমান বা কম বেগে প্রবাহিত হয়। ফলে প্রতিটি ঘটনা তার অন্তর্নিহিত কারণের কিছু সময় পর দেখা যায়। ফলে মহাবিশ্বের সূচনা থেকে সৌরজগতের উৎপত্তি পর্যন্ত কয়েক কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মানুষও প্রতিনিয়ত এই সময় পার হবার যন্ত্রণা ভোগ করছে কেবল বস্তুর সসীম বেগ বা তথ্যের সসীম বেগ থাকার কারণে। যদি এমন হতো যে, বস্তু বা তথ্য অসীম বেগে প্রবাহিত হতো- তবে Cause এবং Effect এর মধ্যে কোনো সময়ের ব্যবধান থাকতো না।

আমাদের দুনিয়া হলো দারুল আসবাব। মানে হলো সবকিছুই কারণের মুখাপেক্ষি। উপকরণ ছাড়া এবং সময় ক্ষেপণ ছাড়া তেমন কোনো ফলাফল লাভ করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় সৃষ্টি বা ‘নাশআতাল উখরা’ বা পরকাল যাকে বলা হয়- সেই পরকালে কোনো সময় ক্ষেপণের প্রয়োজন পড়বে না। সেটি

দ্বার বিলা সাবাব। কোনো কারণ ছাড়াই সব ঘটনা ঘটবে। তবে ১০০% কারণ ছাড়া নয় বটে। সেখানে কারণ হবে মনোগত আর তথ্য প্রবাহ হবে অসীম দ্রুতগতিতে। ফলে মনে হবে কারণ এবং ফলাফল একই সময়ে দেখা দিয়েছে। সেইসাথে উপকরণ তিরোহিত হবে। উপকরণের উদ্ভব শূন্য-সময়-ক্ষেপণে হবে এবং সেই উপকরণ শূন্য-সময়-ক্ষেপণে ফাইনাল রেজাল্ট দেবে। ফলে উপকরণের উদ্ভব ও তা থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর উদ্ভব একই সময়ে হবে বিধায় উপকরণ অদৃশ্য হয়ে যাবে, শুধু কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দেখা মিলবে।

বর্তমানেও এই পৃথিবীতে কার্যকারণের এমন একটি ধারা বহমান, যেখানে উপকরণ দেখা যায় না। এসব ঘটনা যেখানে উপকরণ অদৃশ্য অথচ কাঙ্ক্ষিত বস্তু হাজির- এগুলো হলো আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপে ঘটিত ঘটনা। আল্লাহ তা'আলার নিকট কোনো বস্তুকে বা তথ্যকে গতি প্রদানের শেষ সীমা নেই। এমনকি অসীম গতিতে কোনো উপকরণ, চাই তা বস্তু হোক বা তথ্য হোক, আল্লাহর আদেশে চলতে পারে। ফলে সাধারণ কার্যকারণসূত্র এখানে অনুপস্থিত।

অনেক ওলি-আউলিয়া ছিলেন- এ পৃথিবীতে অতীতে, যারা সাধারণত যে পথ ঘোড়ায় বা উটে চড়ে যেতে কয়েক মাস লাগে- সে পথ তারা হেঁটে কয়েক ঘণ্টায় অতিক্রম করেছেন। এমনকি তারা উপকরণ ব্যতিত বালিকে স্বর্ণে এবং স্বর্ণকে বালিতে পরিণত করেছেন। এগুলো by the intervention of Allah তথা আল্লাহর হস্তক্ষেপে সংঘটিত হয়েছে।

আবার এমনও ঘটনা আছে যেখানে সাধারণ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান মতে যে ঘটনাটি মূলে ফেরানো অসম্ভব- সেটিকে মূলে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের ঘটনা কুরআনে বর্ণিত- যখন আল্লাহ মৃতকে জীবিত কী করে করবেন তা ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম জানতে চাইলেন। তখন আল্লাহ তাকে চারটি পাখি পোষ মানিয়ে, তারপর জবাই করে টুকরো টুকরো করে, চার পাহাড়ে টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিতে বললেন। অতঃপর পাখিগুলোকে ডাক দিতে বললেন। ডাক শুনে পাখিগুলো জ্যান্ত হয়ে ইব্রাহিম আলাইহিসসালামের কাছে চলে এলো। এটি বিজ্ঞানের মতে অসম্ভব

একটি ঘটনা। অথচ তা ঘটেছে। সাধারণ কার্যকারণ সূত্র এখানে ব্যর্থ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতাকে কখনোই মানুষ উপলব্ধিতে পুরোপুরি আনতে সক্ষম নয়- হবেও না।

আল্লাহ এভাবে দুনিয়াতেই পরকালের ঘটনাবলীর উদাহরণ পেশ করেছেন। পরকাল মানে মৃতের পুনরুত্থান। পুনর্জীবন লাভ। এটি বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ বিজ্ঞানকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দান করেছেন। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক। অর্থাৎ কতগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়ম যেগুলো সাধারণত অপরিবর্তিত। তাই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি কোনটির পর কোনটি ঘটবে তা দেখায়। কিন্তু সময় ও স্থানভেদে এসকল বৈজ্ঞানিক নিয়ম ভেঙ্গে চুরমার করে দেন আল্লাহ তা'আলা।

পূর্বে বলেছি বিজ্ঞান এক উপকরণ। একে আপাতঃঅপরিবর্তিত নিয়মাবলির সন্নিবেশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বেকার হয়ে যান নি! যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে আল্লাহ তা'আলা হস্তক্ষেপ করেন এবং বিজ্ঞানকে অকার্যকর করে ফলাফল দান করেন আশ্চর্যজনক বিষয়ের। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এমন খোদা যিনি মানুষের প্রার্থনার বর্তমানকালীন বা দুনিয়াবী ফল দানে সক্ষম এবং দিয়েও থাকেন।

কার্যকর সূত্রকে অকাট্য মেনে যারা বলেন, সবকিছুর কারণ থাকতে হবে। এটা ভুল। আবার যদি কেউ বলেন, সবকিছুর উদ্ভব যদি কারণনির্ভর হয় তবে আল্লাহর আবির্ভাবও কারণনির্ভর হতে হবে। এটা চরম বিভ্রান্তি। সবকিছু কারণনির্ভর নয়। তা দুনিয়াতেই আটপৌরে জীবনে দৃষ্ট। আর, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব! আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের জন্য কারণ লাগবে? এতো চরম মূর্খের দাবি! কার্যকারণ সূত্রের কূয়োয় বন্দী আপাতঃবুদ্ধিজীবীর নিকটই কেবল এমন মূর্খ দাবি শোভা পায়।

আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, তা যখন উপলব্ধিতে সামান্য আনা হবে, তখন যেখা যাবে মানুষ সর্বক্ষণ অভিভূত হয়ে আছে। যার অভিজ্ঞান রয়েছে প্রকৃত কার্যকারণের অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার হস্তক্ষেপের উদাহরণ যার কাছে মজুদ রয়েছে, সে কখনো পরকালের অবশ্যম্ভাবী

অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হতে পারে না। সুতরাং অভিজ্ঞান জরুরি। কখনও যদি মহাবিশ্বের বিস্তৃতি এবং এতে ক্ষমতার যে বিপুল প্রকাশ তা নিয়ে ভাবা হয় গভীরভাবে- তখন বুঝা যাবে, হ্যাঁ- আমরা বড়ই মূর্খ! আল্লাহ তা'আলার জালাল তথা প্রতাপ তখন সামান্য অনুভূত হবে। কখনো যদি বিশ্বের সৌন্দর্যের প্রকৃত উপভোগ এবং সেই সৌন্দর্য সৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভাবা হয়- তখন আল্লাহ তা'আলার অসীম জামাল বা সৌন্দর্য সম্পর্কে সজাগ হওয়া যাবে।

আল্লাহ তা'আলার জামাল এবং জালাল নিয়েই সৃষ্টিজগত আবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বের অযুত কোটি নক্ষত্ররাজির পরিবেশে কতো অযুত কোটি মহাবিস্ফোরণ হচ্ছে আর শক্তির প্রকাশ চলছে- তা কী ভেবে দেখে কেউ? আর সৌন্দর্য! এখানেও হীরকের যে সৌন্দর্য তাতে মুগ্ধ পুরো দুনিয়াবাসী। আর আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মহাবিশ্বে বিশাল বিশাল গ্রহ রয়েছে যার পুরোটাই হীরক! কখনো কেউ ভেবে দেখেছে- কতো সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে এই বিশ্বে?

সুতরাং কার্যকারণের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে আল্লাহ তা'আলার হাতটিকে যখন দেখা হবে, তখন কিন্তু মূর্খতা অবশ্যই বিদায় নেবে। তখন- ঈমান আর ঈমান নিয়ে প্রকৃত সর্বোচ্চ অভিজ্ঞানের শাস্ত্র তাসাওউফের চর্চায় নিমগ্ন হতে কোনো আলস্য আর থাকবে না। সেই মহেন্দ্রক্ষণের আগমন হোক।

পরিচ্ছেদ ২৫

আবির্ভাব বা আল্লাহর সৃষ্টি

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

"Allah said, 'O Iblis! What hindered thee from submitting to what I have created with my two hand?"

"তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে ইবলিস! তোমাকে কীসে বাঁধা দিয়েছে তাকে সাজদা করা থেকে- যাকে আমি স্বয়ং নিজের হাত দিয়ে বানিয়েছি?" (সোয়াদ (৩৫): ৭৫)

অত্র আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক আদম (আ.)-কে সৃষ্টি এবং ইবলিসের তাঁকে (আদম) সাজদার অস্বীকৃতি বর্ণিত হয়েছে। আদম আলাইহিসসালাম আল্লাহর স্বয়ং দু'হাত দিয়ে তৈরি। এটি হলো pure emergence বা পরিপূর্ণ আবির্ভাব যার কোনো কার্যকারণ একমাত্র আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোথাও নেই।

বস্তুত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার আলোচনা অনেক দীর্ঘ। বর্তমানকালের বিজ্ঞানীরা নতুন এক প্রতোলী পেয়েছেন যাকে বলা হয় আবির্ভাব বা emergence। বলা হয়, বিজ্ঞানের যতো অমীমাংসিত সমস্যা রয়েছে সবই emergence ছাড়া অন্যকিছু নিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এই পরিচ্ছেদে তাই আমি আবির্ভাব নিয়ে ও প্রাণিজগতের আবির্ভাব ও মানুষের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করবো।

যে কণা বা দৃঢ় বস্তু বা বৈশিষ্ট্য দৃশ্য বা অদৃশ্য জগতে- কোথাও নেই এবং থাকে না, সেরূপ কিছু যখন দৃশ্যমান হয় বা দৃশ্য-অদৃশ্যের মধ্যবর্তী সম্ভাবনার জগতে আবির্ভূত হয়, তখন এটি আবির্ভাব নামে অভিহিত হবে।

আলোচনা শুরু করছি মহাবিশ্বের উৎপত্তির Big Bang তত্ত্ব থেকে। সে সময়ে অর্থাৎ Big Bang এর মুহূর্তে, যাকে- সময় = শূন্য, বলা হবে তখন

মহাবিশ্বের মোট শক্তি বর্তমানে যা পরিদৃষ্ট হয় তার সমান। এর কারণ প্রকৃতিতে নিত্যতা সূত্র কার্যকর। প্রশ্ন হলো এখন মহাবিশ্বের মোট শক্তি কতো?

এ বিষয়ে জানার জন্য বলছি, মহাবিশ্বের ধনাত্মক শক্তি ও ঋণাত্মক শক্তি উভয়ই রয়েছে। আর ধনাত্মক শক্তির মূল আবাস হলো, ডার্ক এনার্জি যা মহাবিশ্বের মোট শক্তির ৭২% এর বেশি। এই পুরো ৭২% শক্তিই ধনাত্মক। ফলে সাধারণ বিচারেই বলা যায়, মহাবিশ্বের মোট শক্তি কখনই শূন্য হবে না। তবে যদি বাকি ২৮% পুরোটাই ঋণাত্মক হয় এবং যদি ভবিষ্যতে ডার্ক এনার্জির ৭২% এর ভেতর অনেকটা ঋণাত্মক শক্তির উপাদান মিলে, তখন অঙ্কে সামান্য হেরফের হতে পারে কিন্তু মহাবিশ্বের মোট শক্তি কখনোই ঋণাত্মক বা শূন্য হবে না। ফলে মহাবিশ্বটা মানুষের জন্য ফ্রি লাঞ্চ নয়।

বিং ব্যাং এর 'সময় = শূন্য' মুহূর্তে মহাবিশ্বের সেই প্রচণ্ড তাপ-চাপ-বক্রতার অনুপম বিন্দুটিতে মোট একটি ধনাত্মক শক্তি ছিলো। ঐ শক্তি ঐ মুহূর্তে ঐ বিন্দুতে ছিলো বলেই ঐ বিস্ফোরণটি হয়েছিল। প্রশ্ন হলো ঐ শক্তিটুকু মহাবিশ্বের অন্তঃস্থ না বহিঃস্থ? যদি বলি অন্তঃস্থ, তবে 'সময় = শূন্য' মুহূর্তের পূর্বেও তা মহাবিশ্বের নিজস্ব ছিলো। ফলে বলা যায় বিস্ফোরণটি সময় = শূন্য এর পূর্বে সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তাহলে Big Bang এর মুহূর্তটি এখন জানা ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে একটি মুহূর্ত না হয়ে- আরও বেশি আগের হতে পারে।

কিন্তু না, ১৩৭৩ কোটি বছর পূর্বে যে মুহূর্তটি আমরা এখন জানি সে মুহূর্তেই Big Bang হয়েছিল বলে অনেক প্রমাণ রয়েছে। ফলে মহাবিশ্বের মোট শক্তি সময় = শূন্য ধনাত্মক এবং তা মহাবিশ্বের আদি অনুপম বিন্দুটির নিজস্ব বা অন্তঃস্থ নয়। বরং সে শক্তি সময় = শূন্য মুহূর্তে অনুপম বিন্দুটির বাইরে থেকে অনুপম বিন্দুটিতে সঞ্চারিত হওয়া ছাড়া কোনো তাত্ত্বিক বাস্তবতা নেই। সময় = শূন্য মুহূর্তেই শক্তির ট্রান্সফার অন্য সুপার এজেন্ট থেকে অনুপম বিন্দুতে হওয়া ছাড়া মহাবিশ্বের Big Bang বর্তমানে চিহ্নিত সময়ের ঐ মুহূর্তে হওয়া অসম্ভব ছিলো।

সুতরাং শক্তি ট্রান্সফার হয়েছে এবং তা হয়েছে সময় = শূন্য মুহূর্তে। এসেছে Big Bang মুহূর্তে অনুপম বিন্দুতে মহাবিশ্বের স্থান-কালের ঊর্ধ্বে অবস্থানরত এক সুপার এজেন্ট থেকে। তিনি আল্লাহ। তিনি তাঁর হাত দিয়ে মহাবিশ্বের সূচনা করে দিয়েছেন ঐ মুহূর্তে। দেখুন আল-কুরআনের আয়াত: "যারা কুফরি করে তারা কি দেখে না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো, অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি" (২১:৩০)। ফলে সুস্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের একটি আবির্ভাব আছে। আর সেই আবির্ভাবের নিয়ামক আল্লাহ তা'আলা।

দ্বিতীয় আবির্ভাবের বিষয় হলো- Big Bang পরবর্তী মুহূর্তগুলোয় মৌলিক কণাদের আবির্ভাব। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে কণাগুলো অদৃশ্য ও দৃশ্য জগতে এবং অদৃশ্য আর দৃশ্য মধ্যবর্তী সম্ভাবনা জগতে অবস্থান করে। এদের আবির্ভাবকে অবশ্যই পুরোপুরি আবির্ভাব বা pure emergence বলতে হবে। এই pure emergence এর নিয়ামক আল্লাহ তা'আলার কমান্ড 'কুন!' (Be!)। অদৃশ্য জগতেই আল্লাহ তা'আলা এ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নির্দেশে এ কণাগুলো দৃশ্যমান জগতে প্রবেশ করে। অতঃপর দৃশ্য, অদৃশ্য এবং মধ্যবর্তী সম্ভাবনা জগতে অবস্থান নেয়। তবে এদের অস্তিত্ব নির্ভর করে অদৃশ্যে অবস্থানকালে এদের রেকর্ড মনোযোগের সাথে পর্যবেক্ষণের উপর। সে কাজটি আল্লাহ তা'আলা করেন। এজন্যই তিনি 'হালিম' (Forbearing)। দেখুন আল-কুরআন: ৩৫:৪১।

পরবর্তী আলোচ্য বিষয় পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব। প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে মানবজাতিতে দুটি পরস্পর বিরোধী মতবাদ সম্পর্কে সকলেই কম-বেশি জ্ঞাত। জীববিজ্ঞানী এবং সাধারণভাবে ইংরেজি শিক্ষিতদের অধিকাংশ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। বিবর্তনবাদ চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) চিন্তাপ্রসূত যা যতো না পরীক্ষালব্ধ তার চেয়ে বেশি অনুমানপ্রসূত।

বিবর্তনবাদের অনুমানটি আসে মানুষের একটি সহজাত ক্ষমতার হাত ধরে। সেটি হলো, মানুষ ফাঁক পূরণ করতে খুবই পারদর্শী। ডারউইন থেকে যে তত্ত্ব এসেছে সেই তত্ত্বে বলা হয়- নিম্নতর গঠন ও যোগ্যতাবিশিষ্ট প্রাণি থেকে

বিবর্তনের চারটি শক্তির ক্রিয়ার উচ্চতর গঠন ও যোগ্যতার প্রাণিদের উদ্ভব হয়েছে। চারটি শক্তি হলো- Mutation, Migration, Drift ও Natural Selection। এই সবগুলো শক্তিই মূলতঃ অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমরা বিবর্তনবাদ ও এর অসারতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি গ্রন্থের ১৬ নং পরিচ্ছেদে।

তবে Emergence বা আবির্ভাব জীববিজ্ঞানীরা মানেন। তারা বলেন, একটি স্বতস্ফূর্তভাবে প্রজননক্ষম বা নিজের কপি করতে সক্ষম প্রাণকোষের Pure Emergence থাকতেই হবে। সর্বপ্রথম একটি কোষ এসেছিলো বা আবির্ভূত হয়েছিল পৃথিবীতে। কয়েকটি পদ্ধতিতেই সেই আবির্ভাব হয়ে থাকতে পারে বলে তাদের ধারণা। এই একটি Emergence স্বীকার করে নিয়ে অতঃপর সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা Emergence কে অস্বীকার করেন। This is not fair ।

আমাদের তত্ত্ব - Emergence একবার নয়, বহুবার বহুভাবে পৃথিবীতে চলছে। আমার গবেষণার ফল হলো: আমি Emergence কে তিনটি ভাগে ভাগ করি।

১। বিশুদ্ধ আবির্ভাব বা সৃষ্টি

২। ধীর কিন্তু চলমান আবির্ভাব

৩। দ্রুত এবং চাহিত আবির্ভাব

প্রাণিজগতে বিশুদ্ধ আবির্ভাব হলো- সর্বপ্রথম আবির্ভূত স্বরূপসৃষ্টিকারী প্রথম কোষটির আবির্ভাব।

এই কোষটি বিবর্তনবাদী জীববিজ্ঞানীরা LUCA বা Last Universal Common Ancestor বা সার্বজনীন পূর্বকোষ বলে অভিহিত করেন। এই কোষটি তাদের তত্ত্বে তিন ভাবের এক ভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল:

(১) বজ্র বিদ্যুতের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কোনোরূপ জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি স্বরূপসৃষ্টিকারী কোষ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো এবং ঐ Self-

replicating cell-টি অতঃপর সাগরতলে কোনো গুহায় নিজের বাসস্থান করে নেয়।

(২) উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে অন্য কোনো গ্রহ বা গ্রহাণু থেকে একটি Self-replicating cell পৃথিবীতে এসেছিলো যা সাগরতলে আশ্রয় নিয়েছিলো।

(৩) সাগরতলের কোনো গুহায় কোনো এক অজানা কারণে ঐ কোষটির জন্ম হয়েছিল।

আমাদের তত্ত্বমতে LUCA বা সর্বপ্রাথমিক কোষটি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি যা 'কুন' বা 'Be' এর মাধ্যমে অস্তিত্ব পেয়েছিলো। অতঃপর তিন ধরনের Emergence যা পূর্বে উল্লেখ করেছি- ক্রিয়াশীল ছিলো, যার ফলে পৃথিবীতে প্রাণবৈচিত্র্য গুণে-মানে বেড়েছে। বিশুদ্ধ আবির্ভাব পৃথিবীতে কম হলেও Emergence চলছেই। LUCA সাগরে যখন ধীর ধীরে নিজের কপি সৃষ্টি করে বিস্তৃতি লাভ করে- একই ধরনের অসংখ্য কোষ সৃষ্টি করে চলে, তখন ঐসব দ্বিতীয় প্রজন্মের কোষ পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় নতুন যেসব প্রাণকোষ তৈরি হয়- সেগুলো উচ্চতর এবং ওগুলোতে গুণাবলীর বিরাট উন্নয়ন হয়েছিল। সেই উন্নয়নটির উৎস অভিযোজিত পূর্বকোষগুলোতে ছিলো না। প্রতিটি ধাপের উন্নয়নের সাথে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের আগমন হয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ব থেকে ছিলো না। এই হলো Emergence। যা ছিলো না তার আবির্ভাব। যদি এই আবির্ভাবকে মেনে না নেওয়া হয়- তবে দু'টি কোষের অভিযোজনে দ্বিগুণ সাইজের আরেকটি কোষ তৈরি হবে, যারা পূর্বের কোষটির মতোই- পার্থক্য কেবল সাইজে। কিন্তু কেউই এমন অভিযোজনে মূল্য দেবে না। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, কোষগুলোর মিথস্ক্রিয়ায় নতুন উত্তর-প্রজন্ম তৈরি হয়েছিলো একের পর এক, সেগুলো গুণে-মানে নতুন ছিলো এবং বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধি হয়ে চলছিলো। এ হলো Slow but steady emergence।

অতঃপর এমন এক সময়ও এসেছে পৃথিবীতে যখন Emergence অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হয়েছে। এই সময়টাকে বলা হয় Cambrian এবং সে সময়

সৃষ্টিতে যে অসাধারণ বৈচিত্র্য এবং দ্রুতি ঘটেছিলো তার নামকরণ করা হয়েছে Cambrian explosion।

বর্তমানে সারা বিশ্বে দৃষ্ট সকল অঙ্গবৈশিষ্ট্যের উদ্ভব Cambrian explosion এর সময়। প্রায় পঞ্চাশটি ভিন্ন ভিন্ন Phyla-র উদ্ভব তখনকার সংক্ষিপ্ত (ভূতাত্ত্বিক স্কেলে) সময়ে। ঐ Phyla-গুলোর মাধ্যমে বর্তমান কালে দৃষ্ট কোটি কোটি প্রজাতির প্রাণির উদ্ভব। Cambrian বিস্ফোরণকে আমি Fast and favorable emergence বলে অভিহিত করি।

এভাবে পৃথিবীতে প্রাণের বিস্তার- আবির্ভূত বা Emergence -এর মাধ্যমে শুরু এবং সর্বদাই Emergence চলছে। Emergence -এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো- হয় এটি Pure বা বিশুদ্ধ সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার 'কুন' অথবা অন্য কোনো সৃষ্টি। আর যদি দুই বা ততোধিকের মিথস্ক্রিয়ায় নতুন কিছুর সৃষ্টি হয়, সেখানে emergence হলো নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব- যে বৈশিষ্ট্য পূর্বতন কোনোটিতেই ছিলো না। ফলে Emergence প্রক্রিয়ায় দুই+দুই ≠ চার। সব সময়ই In emergence, whole is not equal to the sum total of its parts, whole is more than the sum total.

অতঃপর মানবজাতির আবির্ভাব। এখানে আদম আলাইহিসসালামের আবির্ভাব Pure emergence । কোনো বিবর্তনের মাধ্যমে প্রথম মানবের আগমন নয়। আল্লাহর সৃষ্টি- যাকে বিশুদ্ধ আবির্ভাব বলছি, তিনি হলেন আদম আলাইহিসসালাম। অতঃপর হাওয়া আলাইহাসসালামের সৃষ্টি। সেখানেও Emergence। অতঃপর বংশানুক্রমে মানুষের আগমনের ধারায় যদিও মানুষগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী একই ধরনের, কিন্তু গুণ-মান নতুন নতুন করে আবির্ভূত হয়ই। সর্বদাই চলছে Emergence। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সমান্তরাল ও খাড়া ধারায় - Emergence চলছেই।

Emergence বা আবির্ভাবের স্রষ্টা আল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া এই Emergence এর অন্য কোনো কারণ মহাবিশ্বে উপস্থিত নেই। আল্লাহ তা'আলার কর্মকাণ্ডের এই প্রত্যক্ষ দর্শন- অন্য কোনো দর্শনে তেমনভাবে নেই- যেমন দর্শন এখানে লিখেছি। আর এই দর্শন আল-কুরআন ও আল-হাদিস থেকে পাওয়া। যে কোনো সত্যসন্ধানী একটু মনোযোগ দিলে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবেন।

পরিচ্ছেদ ২৬

নক্ষত্রের প্রাসাদ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ

“By the heavens having mansions of stars.”

“শপথ মহাকাশের, যথায় রয়েছে নক্ষত্ররাজির প্রাসাদসমূহ।” (বুরুজ (৮৫): ১)

প্রথমেই বলে নেই যে, এক আলোকবর্ষ হলো আলো এক বছরে যতটুকু পথ অতিক্রম করে। আর আমাদের মহাবিশ্ব, যা আমার মতে প্রথম আসমান, শত শত মিলিয়ন আলোকবর্ষব্যাপী বিস্তৃত। মহাকাশের বেসিক বিল্ডিং বল্ক বা ইট হলো গ্যালাক্সি। আমাদের সৌরজগত মিল্কিওয়ে (ছায়াপথ) গ্যালাক্সির বাসিন্দা। এ গ্যালাক্সিতে রয়েছে প্রায় দশ হাজার কোটি তারকা। কল্পনা করা যায় কতো বিশাল এই মিল্কিওয়ে। মিল্কিওয়ে দেখতে অনেকটা গোলাকার চাকতির মতো। এই চাকতির ব্যাস দেড় লক্ষ আলোকবর্ষ- আর পুরুত্ব ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ।

মহাকাশের গ্যালাক্সিগুলো একা একা ওখানে এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থিত নয়। অনেকগুলো গ্যালাক্সি মিলিয়ে একটি এলাকায় একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার তৈরি হয়ে আছে। এভাবে মহাকাশে অযুত কোটি ক্লাস্টার ও অনেক সুপারক্লাস্টার রয়েছে। অত্র আয়াতে আল্লাহ কি সেদিকেই ইশারা করলেন না!

যদি সুপারক্লাস্টারকে একটি তারার প্রাসাদ বলা হয়- তবে তা মোটেও ভুল হবে না। এভাবে আল-কুরআনে আমাদের মহাবিশ্ব তথা প্রথম আসমানের গঠন বর্ণনা করেছেন আল্লাহ তা’আলা।

পরিচ্ছেদ ২৭

প্রতিরক্ষা ছাদ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

"It is He Who made the earth a couch for you and the sky a dome."

"তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানালেন, এবং আসমানকে বানালেন ছাদ।" (বাক্বারাহ (২): ২২ অংশ)

অত্র আয়াতে আসমানকে উল্লেখ করা হয়েছে- 'আস-সামাআ বিনা-আ"। যার অর্থের মধ্যে রয়েছে অর্ধ গোলাকার ছাদ বা ছাউনি যা একপ্রকার তাঁবুর মতো আবরন, বেদুঈনরা যেগুলো ব্যবহার করতো। ছাদ বা ছাউনি হিসেবে আসমানকে নামকরণের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের প্রতিরক্ষাধর্মী আবরন যা পৃথিবীকে বাইরের বস্তুরাজির আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

যদিও আমরা সচেতন নই তবু এক বিশাল-সংখ্যক মিটিওর (meteor) বা উল্কা পৃথিবীতে এসে আছড়ে পড়ে। এমনটি ঘটে ছলেছে অন্যান্য গ্রহদের বেলায়ও। অন্যান্য গ্রহে উল্কা পতনে ছোট-বড়ো গর্ত হলেও পৃথিবীর বেলায় তা হয় না। এর কারণ এই যে, বায়ুমণ্ডল ঐসব উল্কাকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিরোধ করে।

বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর উল্কাগুলো বেশিক্ষণ ঐ প্রতিরোধের সামনে টিকে থাকতে পারে না- এবং ওরা ঘর্ষণের কারণে ওদের অধিকাংশ ভর হারিয়ে ফেলে। এই যে বিপদ, যা বায়ুমণ্ডল না থাকলে এড়ানো যেতো না। ধন্যবাদ আল্লাহকে আর আল্লাহর সৃষ্ট বায়ুমণ্ডলকে।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি ও এর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে কারো কিছু জানা ছিলো না। অথচ আল-কুরআনে এ সংক্রান্ত বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেখছি আমরা। এটা আল-কুরআনের অলৌকিকতার প্রমাণ বহন করে।

পরিচ্ছেদ ২৮

গোলাকার পৃথিবী

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ * يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ

"He has created the heavens and the earth for truth. He wraps up the night up in the day, and wraps the day up in the night."

"তিনি সত্যসহকারে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিন দ্বারা মুড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাত দ্বারা মুড়িয়ে দেন।" (যুমার (৩৯): ৫ অংশ)

আরবি অভিধানে 'য়ুকাব্বির' শব্দটির অর্থ করা হয় একটি জিনিষকে অপর একটির চারদিকে মোড়ানো, যেমনটি পাগড়ি পরিধানে করা হয়ে থাকে। যে তথ্য অত্র আয়াতে দেওয়া হয়েছে রাত এবং দিন সম্পর্কে যে, ওরা একে অপরের উপর মুড়িয়ে যায়- তা এ কথাই পরিষ্কার করে যে, পৃথিবীর একটি সুনির্দিষ্ট আকার রয়েছে। আর সে আকার একমাত্র হতে পারে- অত্র আয়াত মতে, গোলাকার।

যে সময়ে এই তথ্য কুরআনে সন্নিবেশিত হয়েছে তখন কিন্তু বিশ্বব্যাপী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ও সাধারণ মানুষ মনে করতো পৃথিবী সমতল- গোলাকৃতির তো নয়ই। ১৪০০ বছর পূর্বে বর্তমানকালের ধারণা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে আল-কুরআনে। একি আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রমাণ করে না?

পরিচ্ছেদ ২৯

আকাশ যা ফিরিয়ে দেয়

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

"(I swear) by heaven which returns."

"শপথ আকাশের যা ফিরিয়ে দেয়।" (তারিক্ব (৮৬): ১১)

আরবি 'الرَّجْعِ' শব্দটি কুরআনিক তরজমায় সাধারণত বুঝানো হয় "ফিরিয়ে দেওয়া" (sending back or returning)। যেমনটি বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর উপরস্থ বায়ুমণ্ডল অনেকগুলো স্তরে বিভক্ত। প্রত্যেকটি স্তর সুনির্দিষ্ট কর্মসাধন করে পৃথিবীস্থ জীবনের কল্যাণে। গবেষণায় দেখা গেছে, এই স্তরগুলো তাদের উপর আপতিত বস্তুরাজি হয় মহাকাশে ফিরিয়ে দেয় কিংবা ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীতে। যেমন, সাগর লেবেল থেকে ১৫ কিলোমিটার উপর পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর নিম্নতম ট্রপোস্ফেয়ার। পৃথিবী থেকে যে জলীয়বাষ্প উর্ধ্বাকাশে যায় সেগুলোকে এই ট্রপোস্ফেয়ার জমিয়ে পানিতে পরিণত করে এবং অতঃপর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়।

ওজোন স্তর, যা স্ট্রাটোস্ফেয়ারের নিম্নস্তর এবং ২০ কিলোমিটার উর্ধ্বে, ক্ষতিকর বিকিরণ রশ্মি এবং অতিবেগুনি রশ্মি যা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেগুলোকে পুনরায় মহাকাশে ফেরৎ পাঠায়।

আয়নোস্ফেয়ার যার অবস্থান পৃথিবী থেকে ৬০ হতে ১০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে বিস্তৃত, রেডিও তরঙ্গকে প্রাতফলিত করে, ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় রেডিও তরঙ্গ ছড়িয়ে যায়। এটা যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহের মতোই ফাংশন করে। এরূপে এই স্তর যোগাযোগ, রেডিও ও টেলিভিশন সম্প্রচারকে বহু বহু দূরব্যাপ্তি কার্যকর করে তোলে।

ম্যাগনেটোস্ফেয়ার স্তর সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় কণাসমূহ, যা অন্যান্য তারকা থেকেও আসে, মহাকাশে ফিরিয়ে দেয় পৃথিবীতে আসার পূর্বেই।

উক্ত আলোচনায় এটা পরিস্ফূট হলো যে, সত্য সত্যই প্রজ্ঞাময় আল-কুরআন অলৌকিক যা ১৪০০ বছর পূর্বে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ফাংশনের দিকে ইশারা করেছে।

পরিচ্ছেদ ৩০

ভূমণ্ডলের সাত স্তর

اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ

“It is Allah Who created the seven heavens and of the Earth the same number.”

“আল্লাহই সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীরও রয়েছে সমান সংখ্যা।” (তালাক্ব (৬৫): ১২)

অত্র আয়াতে যে তথ্যগুলো পরিবেশন করা হয়েছে তা আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত সত্য। বায়ুমণ্ডলের আকাশের যেমন সাতটি স্তর রয়েছে, ভূমণ্ডলেরও তেমনি সাতটি স্তর আছে। এগুলো হলো:

১ম স্তর: লিথোস্ফেয়ার (পানি)

২য় স্তর: লিথোস্ফেয়ার (মাটি)

৩য় স্তর: এসথেনোস্ফেয়ার

৪র্থ স্তর: উপর ম্যান্টেল

৫ম স্তর: নিম্ন ম্যান্টেল

৬ষ্ঠ স্তর: বাইরের কেন্দ্রিন

৭ম স্তর: কেন্দ্রীয় কেন্দ্রিন

লিথোস্ফেয়ার শব্দটির মানে হলো পাথরের স্তর। এটিই ভূমণ্ডলের উপরিস্থিত স্তর। এটি খুবই পাতলা অন্যান্য স্তরের তুলনায়। সাগরতলের লিথোস্ফেয়ার আরো পাতলা এবং সেটি আগ্নেয়গিরির আবাসস্থল। লিথোস্ফেয়ারের গড় পুরু হেলো ৮০ কিলোমিটার। এটি অধিকতর ঠাণ্ডা ও শক্ত অপরাপর স্তরের তুলনায়। এটিই মূলত ভূমণ্ডলের শেল।

লিথোস্ফেয়ারের নিচে রয়েছে এসথেনোস্ফেয়ার যা কিনা অশক্ত। এটি লিথোস্ফেয়ারের চেয়ে পাতলা স্তর এবং চলমান। এটি গরম- প্রায় সলিড বস্তু দ্বারা গঠিত। এছাড়া এটি উচ্চ তাপমাত্রায় গলে যায়- এবং উচ্চ চাপেও।

এই দুটি স্তরের নিচে রয়েছে অতিউচ্চ তাপমাত্রার প্রায় ২৯০০ কিলোমিটারব্যাপি পুরু প্রায় সলিড পাথরের স্তর যার নাম ম্যান্টেল। ভূমণ্ডলের উপরস্থ স্তরের চেয়ে অধিক লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম রয়েছে ম্যান্টেলে। এটি একইসাথে অনেক উচ্চ তাপমাত্রাসম্পন্ন- কারণ তাপমাত্রা ও ঘনত্ব বাড়তে থাকে যতোই আমরা ভূমণ্ডলের ভেতরের দিকে দৃষ্টিপাত করি।

ভূমণ্ডলের কেন্দ্রে রয়েছে একটি কেন্দ্রিন (core) এবং এটি ম্যান্টেলের প্রায় দ্বিগুণ ঘনত্বের। এর কারণ হলো এটি অধিকতর লৌহ ও নিকেল ধারণ করে।

ভূমণ্ডলের core দুটি ভাগে বিভক্ত। উপরের স্তরটি ২২০০ কিলোমিটার পুরু এবং তরলাক্ত। নিচেরটি ১২৫০ কিলোমিটার পুরু ও ঘন বস্তু দ্বারা তৈরি। ভূমণ্ডলের core -এর তরল অংশটি ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে যখন ভূমণ্ডলের ঘূর্ণন চলতে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের সাত স্তর ও ভূমণ্ডলের সাত স্তর অতি সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা জানা হয়েছে। ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় আল-কুরআন অলৌকিক এক গ্রন্থ যা মহান প্রভু আল্লাহর বাণী।

পরিচ্ছেদ ৩১

সুদৃঢ় পর্বতসমূহ

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ

“We placed firmly embedded mountains on the earth, so it would not move under them.”

“আমি জমিনের উপর সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ রেখে দিয়েছি যেনো তা ওদের নিয়ে নড়াচড়া করতে পারে না।” (আম্বিয়া (২১): ৩১)

অত্র আয়াতে আল্লাহ বলছেন, পাহাড়সমূহকে এজন্যই বসানো হয়েছে যেনো পৃথিবী শক বা বিকম্পন হজম করতে পারে। এই তথ্য আল-কুরআন নাযিলের সময় কারোরই জানা ছিলো না। মাত্র সেদিন ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য উদঘাটিত হয়েছে।

পূর্বে মনে করা হতো পাহাড়সমূহ কেবলই একেকটি উঁচু ইমারত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখলেন পাহাড়ের মূল মাটি থেকে তার উচ্চতার ১০-১৫ গুণ বেশি মাটির নিচে প্রোথিত। ফলে পাহাড় পেরেকের মতো কাজ করে যেমনটি তাঁবু খাটাতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ এভারেস্ট পর্বতের চূড়া মোটামুটি ৯ কিলোমিটার উঁচু মাটি থেকে- কিন্তু এর মূল মাটির নিচে ১২৫ কিলোমিটারেরও বেশি।

পৃথিবীর পৃষ্ঠসংলগ্ন crust (আরবন স্তর) সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন নয়। এটিতে যে ফাটল আছে তা crust -কে দু’টি ভাগে ভাগ করে। এদেরকে বলে plate। যখন দুটি প্লেট সংঘর্ষে আসে তখন শক্তিশালী প্লেটটি দুর্বল প্লেটের উপরে উঠে আর নিচের দুর্বল প্লেটটি মাটির গভীরে যেতে থাকে। উপরের প্লেটটি কিছুটা বাঁকা হয়ে যায় এবং তৈরি করে উদ্বত পর্বত। ফলতঃ পর্বতের যেটুকু অংশ উপরে থাকে তার চেয়েও বেশি অংশ মাটির নিচে থাকে।

আল-কুরআনের অন্যত্র পর্বতের এই ভূমিকার কথাই বালা হয়েছে স্পষ্টভাষায়। যেমন:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

"Have not We made the earth as a bed and the mountains its pegs?"

"আমি কি পৃথিবীকে শয্যা বানাইনি- এর পর্বতসমূহকে এর উপর পেরেক বানিয়েছি?" (নাবা (৭৮): ৬-৭)

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

"And the mountains He has firmly fixed."

"এবং পর্বতসমূহকে তিনি কঠিন ও শক্ত করেছেন।" (নাযিয়াত (৭৯): ৩২)

অত্র আয়াতের শব্দ 'أَرْسَاهَا' এর মানে হলো 'যাকে মূলসহ বানানো হয়েছে, যাকে সুনির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়েছে, পৃথিবীর ভেতর পেরেক করা হয়েছে'। এমনিভাবে পর্বতসমূহ পৃথিবীর উপরিতল ও নিচের একই রেখা বরাবর রয়েছে এবং এই রেখাকে ওরা শক্তভাবে পেরেকের মতো ধরে রেখেছে। সংযোগ বলা যায়, কাঠের তক্তাকে যেমনভাবে পেরেক মেরে মিশ্র করা হয়, তেমনিভাবেই পর্বতসমূহ পৃথিবীর স্তরগুলোকে শক্ত বাঁধনে ধরে রেখেছে।

পরিচ্ছেদ ৩২

পৃথিবীর পৃষ্ঠ জিওয়েড

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

“After that He smoothed out the Earth”

“এরপর যমিনকে তিনি (বিছানার মতো) বিছিয়ে দিয়েছেন।” (নাযিয়াত (৭৯): ৩০)

অত্র আয়াতের ‘دَحَا’ শব্দটি মূল আরবি ভাষার শব্দ। এর তরজমা হলো ‘নিখুঁত সমতল করা’। শব্দটি এসেছে ‘দাহাও’ শব্দ থেকে যার তরজমা ‘বিছিয়ে দেওয়া’। আর এই বিছিয়ে দেওয়া বা ‘দাহাও’ এর মধ্যে আছে গোলাকৃতি করা। ‘দাহাও’ থেকে উৎপন্ন অন্যান্য শব্দেও গোলাকৃতি করার মানে আছে।

বস্তুতঃ পৃথিবী গোলাকার, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। সামান্য সমতলীয়ভাবসহ পৃথিবীর গোলাকার আকৃতিকে বলে “geoid”। তাই দাহাও শব্দটি পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত অর্থবহ। কারণ এটি geoid-কে নির্দেশ করে এবং পৃথিবী যে পুরোপুরি গোলাকার নয় তা পরিষ্কার করে বলে দেয়।

শত শত বছর ধরে মানুষ মনে করতো পৃথিবী বুঝি পরিপূর্ণ সমতল। কিন্তু অতি সম্প্রতি এসে পৃথিবীর পৃষ্ঠ যে geoid বা সামান্য সমতলীয় গোলাকার-তা জানা গেছে। সুবহানাল্লাহ! অত্যাধুনিক জ্ঞান আল্লাহ তা’আলার বাণীতে ১৪০০ বছর পূর্বেই বিদ্যমান।

পরিচ্ছেদ ৩৩

বায়ুমণ্ডলের উপকারী ভূমিকা

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا * وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

“We made the sky as preserved and protected roof yet still they turn away from Our Signs.”

“আমি আকাশকে একটি সুরক্ষিত ছাদ হিসেবে তৈরি করেছি, কিন্তু এ (নির্বোধ) ব্যক্তিরা তাঁর নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।” (আম্বিয়া (২১): ৩২)

আকাশের এই ভূমিকা বিংশ শতাব্দিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর চারদিকের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীস্থ জীবনের রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বায়ুমণ্ডল অসংখ্য উল্কাখণ্ডকে পৃথিবীতে পতিত হওয়া থেকে বাঁধা দেয় যখন ওগুলো পৃথিবীমুখী আসতে থাকে এবং এভাবে জীবনের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

এছাড়াও বায়ুমণ্ডল মহাকাশ থেকে আসা ক্ষতিকারক বিকিরণ শোষণ করে নেয়। সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো বায়ুমণ্ডল সেইসব বিকিরণকে পৃথিবীতে আসতে দেয় যেগুলো ক্ষতিকারক তো নয়ই বরং প্রয়োজনীয়। এগুলো হলো অতিবেগুনী রশ্মি, রেডিও তরঙ্গ ইত্যাদি। এসব বিকিরণ জীবনের নিয়ামক। অতিবেগুনী রশ্মি যারা অতিবেগুনী নয়- যেগুলো আংশিকভাবে পৃথিবীতে পৌঁছে- এরা বৃক্ষের সালোকসংশ্লেষণের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়, ফলে জীবনধারনের অতি সহায়ক। কারণ, সালোকসংশ্লেষণ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই বৃক্ষরাজির সবুজ পত্রাদি অক্সিজেন তৈরি করে বায়ুমণ্ডলে ছাড়ে- যা মানুষসহ প্রাণিরা শ্বাসের মাধ্যমে দেহের ভেতর নেয় ও বেঁচে থাকে।

সূর্য থেকে আসা তীব্র অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর দ্বারা শোষিত হয়ে যায়। কেবল সামান্য এবং প্রয়োজনীয় অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছায়।

বায়ুমণ্ডলের জীবনরক্ষাকারী ভূমিকা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে রক্ষা করে মহাকাশের বায়শীতল ঠাণ্ডা থেকে যার তাপমাত্রা শূন্য থেকে ২৭০° সেন্টিগ্রেড নিচে (-২৭০°)।

আল্লাহ তা'আলা আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে বায়ুমণ্ডলের ভূমিকাগুলোর দিকে ইঙ্গিত দিয়ে আয়াত (২১:৩২) নাযিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ!

পরিচ্ছেদ ৩৪

জলে-স্থলে বিপর্যয়

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"Corruption has occurred on land and sea because of what men's hands have wronged, that He may make them taste fruits of the same of their doings, so that they may turn back from evil."

"মানুষের কৃতকর্মের ধরুন স্থলে জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে, (মূলত) তিনি তাদের কতিপয় কাজকর্মের জন্যে তাদের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে চান, সম্ভবত তারা (সেসব কাজ থেকে) ফিরে আসবে।" (রুম (৩০):৪১)

বর্তমান কালের জন্য এই আয়াত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে পৃথিবী এক মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন। মানুষ কলকারখানা, গাড়ি, ফ্রিজ ইত্যাদির ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়েছে। ফলে সমগ্র পৃথিবী বায়ুমণ্ডলসহ অনেক উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। এই উত্তাপের ধরুণ পৃথিবীর ঋতুচক্রে পরিবর্তন এসে গেছে। বৃষ্টির পরিমাণে কোনো হিসাবই নেই।

তদুপরি ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে। সাগরে সুনামি নামক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে চলছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড ওজোন স্তরে ফুটো করে দিয়েছে এবং অজোন স্তরকে পাতলা করে দিচ্ছে। ফলে মহাকাশ থেকে ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে অধিক মাত্রায় আসছে। এর ফলে জীবন-যাপন দুর্বিষহ হয়ে পড়ছে। অসুখ-বিসুখ বেড়ে চলছে আর নিত্য নতুন অসুখের দেখা মিলছে।

বর্তমানে করোনাভাইরাসে পৃথিবীব্যাপি (এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় পর্যন্ত) প্রায় ছয় লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ এই ভাইসারটি এক মিলিমিটারের ১ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র বড়। এজন্যই আল্লাহ বলেন:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ * وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

"And none can know the forces of thy Lord, except He; and this is no other than a warning to mankind."

"আপনার পালনকর্তার (বিশাল) বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন; এটা তো মানুষের জন্যে সতর্কতা বৈ নয়।" (মুদ্দাসসির (৭৪): ৩১ অংশ)

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কীসের মাধ্যমে মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য পরীক্ষা করবেন তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে পৃথিবীর বর্তমান বিপর্যয়কর অবস্থা সম্পূর্ণই মানুষের কৃতকর্মের ফল। সুতরাং আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিৎ এবং পাপ ও উপভোগ থেকে ফিরে আসা উচিৎ।

পরিচ্ছেদ ৩৫

আঙ্গুলের ছাপ

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

"Yes, We are able to put together in perfect order the very tips of his fingers."

"অবশ্যই আমি তো বরং তার (মানুষের) আঙ্গুলের অগ্রভাগকে পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করে দিতে পারবো।" (ক্বিয়ামাহ (৭৫): ৪)

অত্র আয়াতে আঙ্গুলের ছাপের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া একটি বিশেষ অর্থবহ। কারণ, প্রত্যেকের আঙ্গুলের ছাপ তার জন্য অনুপম। প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তি বা কেউ কখনও এই পৃথিবীতে জীবন-যাপন করেছে, তার আঙ্গুলের ছাপ অনুপম অর্থাৎ অন্য কারো আঙ্গুলের ছাপের সাথে তার ছাপ মিলবে না। এজন্যই আঙ্গুলের ছাপ ব্যক্তি পরিচয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপি এর ব্যবহার চলছে।

কিন্তু আশ্চর্যজনক হলো বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে আবিষ্কার করেছেন। ইতোপূর্বে আঙ্গুলের ছাপকে নিছক কয়েকটি রেখা হিসেবেই মনে করা হতো- যার কোনো বিশেষ ভূমিকা আছে বলে কেউই জানতো না। কিন্তু আল-কুরআনে আল্লাহ পাক অঙ্গুলির অগ্রভাগের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে। আঙ্গুলের অগ্রভাগের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত আঙ্গুলের ছাপ। তাই আল-কুরআনে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে কেবল প্রথমটির উল্লেখ করে। মধ্যযুগে কেউই এ বিষয়টি খেয়াল করে নি- কিন্তু আজ আমরা এই আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করেছি বলেই বিশ্বব্যাপী আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার হয় ব্যক্তি পরিচয়ের এক অনন্য মাধ্যম হিসেবে।

পরিচ্ছেদ ৩৬

পানিচক্র

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا * كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

“It is He Who sends down water in due measure from the sky by which We bring a dead land back to life. That is how you too will be raised (from the dead).”

“তিনি আকাশ থেকে পরিমাণমতো পানি বর্ষণ করেন এবং (তা দিয়ে) মৃত জমিনকে জীবন দান করেন। (একইভাবে) তোমরাও (মৃত্যুর পর একদিন) পুনরুত্থিত হবে।” (যুখরুফ (৪৩): ১১)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিমাণমতো পানি বর্ষণের ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটা জানা গেছে যে, ১৬০ লক্ষ টন (প্রায়) পানি পৃথিবী থেকে বাষ্পিভূত হয়ে আকাশে যায়। এতে বুঝা যায় বছরে প্রায় ৫১৩ কোটি টন পানি বাষ্পিভূত হয়। এই সংখ্যাটি বছরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ বৃষ্টি পতিত হয় তার সমান। অর্থাৎ পানি নিরবচ্ছিন্নভাবে একটি সুশৃঙ্খল চক্রে পৃথিবী থেকে আকাশে এবং আকাশ থেকে পৃথিবীতে চলাচল করে। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব এই পানিচক্রের উপর নির্ভর করে। যদি মানুষ সকল প্রযুক্তি কাজে লাগায় তবুও এই পানিচক্র তৈরি করতে সক্ষম হবে না।

এমনকি এই পানিচক্রের হিসেবে যদি সামান্যতম ব্যত্যয় হয় তাহলে সত্বরই বিশাল পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে এবং পৃথিবীস্থ প্রাণ হুমকির সম্মুখীন হবে। তবে এই ভারসাম্যহীনতা কখনই দেখা দেয় না এবং বৃষ্টি প্রতিবছর সমান পরিমাণে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, যেমনটি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ৩৭

দুই সমুদ্রের সংযোগস্থলে পর্দা

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ

"He has let loose the two seas, converging together, with a barrier between them, they do not break through."

"তিনি দুটি সমুদ্রকে ছেড়ে দিয়ে রেখেছেন যেনো তা একে অপরের সাথে মিশে যেতে পারে, (তারপর) তাদের উভয়ের মাঝে (রয়ে যায় এমন) একটি অন্তরাল- যার সীমা তারা কখনও অতিক্রম করতে পারে না।" (আর-রাহমান (৫৫): ১৯-২০)

সমুদ্রের এই ধর্ম যে, ওরা একসাথে প্রবাহিত হয় কিন্তু একে অপরের সাথে মিশে যায় না। এটি সমুদ্রবিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। ভৌত একটি বল যাকে বলে পৃষ্ঠটান (Surface tension) এর কারণে, দুটি সমুদ্রের পানি একত্রে মিশে যায় না। দুটি সমুদ্রের পানির ঘনত্বের তারতম্যের কারণে সমুদ্রের দুটি পানিকে একে অপরের সাথে মিশতে দেয় না।

আশ্চর্যজনক হলো যখন মানুষ পদার্থবিদ্যা, পৃষ্ঠটান কিংবা সমুদ্রবিজ্ঞান এসব জানতো না, আল-কুরআনে এ সংক্রান্ত অতি বড়ো বৈজ্ঞানিক বিষয় উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

পরিচ্ছেদ ৩৮

বৃষ্টির সৃষ্টি

اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ * فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

"It is Allah Who sends the winds, and they raise the clouds: then does He spread them in the sky as He wills, and break them into fragments, until thou seest rain-drops issue from the midst thereof: then when He has made them reach such of his servants as He wills behold, they do rejoice!"

"আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন ও তাকে টুকরো টুকরো করেন। (এক পর্যায়ে) তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকেই চান তার ওপরই তা পৌঁছুয়ে দেন। তখন তারা (এটা দেখে) ভীষণ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়!" (রুম (৩০): ৪৮)

কীভাবে বৃষ্টি তৈরি হয় তা বহুকাল পর্যন্ত এক অজানা বিষয় হয়ে রয়েছিলো। মাত্র কিছুকাল পূর্বে আবহাওয়া রাডার (Radar) আবিষ্কারের পর জানা গেছে কী কী পর্যায় পেরিয়ে বৃষ্টি সৃষ্টি হয়। সেমতে বৃষ্টি সৃষ্টি হবার তিনটি পর্যায় রয়েছে।

প্রথমতঃ জলীয় বাষ্প যার দ্বারা পানি আকাশে উত্থিত হয়। অতঃপর মেঘমালা তৈরি হয় এবং অবশেষে বৃষ্টি কণা দেখা দেয় ও পৃথিবীর জমিনে পতিত হয়।

আল-কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতে এই তিনটি পর্যায়েরই বিশদ বর্ণনা আল্লাহ করেছেন। এখন আমরা প্রযুক্তির দৃষ্টি দিয়ে এগুলোর বিশ্লেষণ করবো।

১ম পর্যায়: "আল্লাহ তা'আলা বায়ু প্রেরণ করেন ..."

সমুদ্রের পানি থেকে অসংখ্য বাষ্পের বুদবুদ প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয় এবং এভাবে জলকণা আকাশের দিকে নীত হয়। এই কণাগুলো যারা লবণযুক্ত অতঃপর বায়ু দ্বারা বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়। এই কণাগুলো যাদেরকে বলা হয় এরোসল (aerosols), জলকণার জন্য ফাঁদ। এরাই তৈরি করে মেঘকণা আশপাশের জলীয় বাষ্পকে আকর্ষণ করে। এভাবে সমুদ্র থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি ঊর্ধ্বাকাশে জড়ো হয়।

২য় পর্যায়: "... তারপর তিনি যেভাবে চান তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন ও তাকে টুকরো টুকরো করেন ..."

জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয় লবণকণা ও অন্যান্য ধূলিকণার উপর এবং এভাবে মেঘমালা তৈরি হয়। যেহেতু জলকণার ড্রপগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র (০.০১ থেকে ০.০২ মিলিমিটার মাত্র), মেঘমালা বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতে সক্ষম এবং এরা বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে যেতে পারে। এভাবে আকাশ মেঘমালায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

৩য় পর্যায়: " ... তুমি দেখতে পাও তার ভেতর থেকে বৃষ্টি (কণা) বেরিয়ে আসছে .. "

লবণকণা ও ধূলিকণার ঘনিভূত হওয়া জলকণাগুলো একটু একটু করে বড় হয় ও বৃষ্টিকণায় পরিণত হয়। ফলে বৃষ্টিকণা যারা বাতাসের চেয়ে ভারী ওরা মেঘখণ্ডের নিচের দিকে ধাবিত হয় এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি হিসেবে পতিত হয়।

এভাবে আমরা দেখছি বৃষ্টি সৃষ্টির প্রতিটি পর্যায়ের কথা উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন। তদুপরি- বৃষ্টিকণা সৃষ্টির পর্যায়গুলো ক্রমানুসারে বিবৃত হয়েছে উপর্যুক্ত আয়াতে।

এভাবে এ্যাটমসস্ফেয়ারিক বিজ্ঞান (বা বায়ুমণ্ডলের বিজ্ঞান) আবিষ্কার করার ১৪০০ বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টির সৃষ্টি ওদের সম্পূর্ণ ক্রম অনুযায়ী ও বিজ্ঞান অনুযায়ী বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

পরিচ্ছেদ ৩৯

আলো ও অন্ধকার

لْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

"Praise be to Allah Who created the heavens and the earth, and created the darkness and the light."

"সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আঁধার এবং আলো।" (আন'আম (৬): ১)

এই অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ আয়াত নিয়ে অনেক (আধুনিক) ব্যাখ্যাকার ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্র আয়াতে প্রথমে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির কথা বলেছেন এবং অতঃপর বলেছেন অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা। আসমান-যমিনের সৃষ্টি যে আল্লাহ্ কর্তৃক এবং এগুলোর সৃষ্টি যে প্রকৃতই ex nihilo (অনস্তিত্ব থেকে) তা সকলেই জানেন। তবে পরবর্তী অংশে 'جَعَلَ' শব্দের অর্থ অনেকেই করেছেন 'Made' দ্বারা। কিন্তু আমার মতে 'Made' নয় হবে 'Created'। কারণ আলো এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এটি সৃষ্টি হয় কোনো কিছু পুড়লে বা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় দুটি অণুর সংযোগের ফলে উদ্ভূত শক্তি থেকে।

বিংশ শতাব্দির প্রথমেই জানা গেছে আলো এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এটি মূলতঃ তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এই তরঙ্গের রয়েছে বিশাল ব্যাপ্তি। এই বিশাল ব্যাপ্তি হলো তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যার দিক দিয়ে। এক বিশাল লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য অঙ্কন করে করে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের যে ধর্মগুলো পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে একটি ক্ষুদ্র অংশই দর্শনীয় বা দর্শনে সাহায্যকারী। এটিকে বলে Visible Spectrum।

এই Visible Spectrum -কেই আমরা আলো নামে চিনি। Visible Spectrum -এর সর্ববামে থাকে বেগুনি রশ্মি ও সর্বডানে থাকে লাল রশ্মি। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন কেবল এটমিক ও নিউক্লিয় বিক্রিয়ায় এই দৃশ্যমান

আলো (Visible light) সৃষ্টি হয়। তদুপরি আলো এক বিচিত্র ধর্মসম্পন্ন। এটি কণা (Particle) ধর্মীয় ও আবার একই সময় তরঙ্গ (Wave) ধর্মীয়।

মোটকথা, আলো এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। তাহলে 'جَعَلَ' শব্দের পরবর্তী শব্দটি হলো 'الظُّلُمَاتِ' বা অন্ধকার। আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ অন্ধকার সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন। তারা বলেছেন- পৃথিবীতে ১২ ঘণ্টা পর পর আলো ও অন্ধকার আসে। এটাই নাকি আল্লাহর অন্ধকার ও আলো সৃষ্টির রহস্য!

কিন্তু না- পৃথিবীতে যে অন্ধকার ১২ ঘণ্টা পর পর আসে তা হলো, absence of light -আলোর অনুপস্থিতি। এটি কোনো মৌলিক সৃষ্টি নয়। আলো থাকে না (পৃথিবীর অপরপ্রান্তে সূর্য থাকার ফলে), তাই অন্ধকার হয়ে যায়।

কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ বলছেন এমন এক আবিষ্কারের কথা যা মৌলিক সৃষ্টি- অর্থাৎ absence of light নয়। এই মৌলিক সৃষ্টির সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়ে গেছেন। মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও এর সংশ্লিষ্ট মন্দনরাশি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মহাবিশ্বের মোট ভরের ও শক্তির ৭২%-ই হলো ডার্ক মেটার (অন্ধকার বস্তু)। এই ডার্ক মেটার এমন যে, এটি আলোর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। আমাদের পৃথিবী যদিও নিজে আলো সৃষ্টি করে না- তবে আলোর সঙ্গে এটি বিক্রিয়া করে। সুতরাং অসংখ্য যে গ্রহ রয়েছে মহাবিশ্বে এগুলো ডার্ক মেটার নয়। ডার্ক মেটার দেখা যায় না। কারণ ডার্ক মেটার আলো প্রতিফলন করে না। বা শোষণও করে না।

এই যে ডার্ক মেটার- এটি তাই এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি, যেমন আলোও এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি। ডার্ক এনার্জিও প্রায় একই রকম। একে আলোক রশ্মিতে পরিণত করা যায় না। তাই ডার্ক এনার্জি প্রকৃতই ডার্ক বা অন্ধকার।

সুতরাং উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ডার্ক মেটার ও ডার্ক এনার্জি সৃষ্টি করার কথা বলছেন যে, সৃষ্টি ex nihilo বা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা।

সুবহানাল্লাহ! ১৪০০ বছর পূর্বে আল্লাহ সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে পাওয়া বস্তুর কথা কুরআনে বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে কোনোকিছুর কথা ইশারা-ইঙ্গিতে বলতেও ছাড়েন নি।

পরিচ্ছেদ ৪০

মহাবিশ্বের সীমা

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا * لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

"O you assembly of Jinns and men! If it be you can pass beyond the zones of the heavens and the earth, you pass! Not without authority shall you able to pass."

"হে জিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সীমারেখা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের থাকে তবে (যাও! অতঃপর) তা অতিক্রম করেই দেখো। (কিন্তু আমার দেওয়া বিশেষ) ক্ষমতা ছাড়া তোমরা কিছুতেই (এ সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না।" (আর-রাহমান (৫৫): ৩৩)

আজও সুদূরপ্রসারী অর্থবহ এ পবিত্র আয়াত। বর্তমানকালের আধুনিক মহাকাশবিজ্ঞানীরা দ্বিধাদ্বন্ধে আছেন এই কথায় যে- মহাবিশ্বটা কী অসীম না সসীম? যেহেতু মহাবিশ্ব ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে- তাতে মনে হয় মহাবিশ্বটা অসীমকে ছুঁয়ে ফেলবে। অর্থাৎ মহাবিশ্বটা হয়ে যাবে অসীম। কিন্তু আইনস্টাইন প্রথমদিকে সসীম মহাবিশ্বের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীতে তার অবস্থান তিনি পাল্টান।

কিন্তু উপর্যুক্ত আয়াত-দৃষ্টে এটা সুস্পষ্ট যে, মহাবিশ্বের সীমা আছে। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে হতে এক সময় সেই সীমারেখায় পৌঁছুয়ে থেকে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় সূরা ওয়াক্বিয়াহর এক আয়াত থেকে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা তারকাসমূহের অস্তগামিত হবার শপথ নিয়েছেন। অর্থাৎ তারকাসমূহ মহাবিশ্বের প্রান্তসীমায় পৌঁছুয়ে বিলীন হয়ে যায় বা অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

মোটকথা, মহাবিশ্বের একটি সীমানা বা Boundary আছে- যদিও কিনা মহাবিশ্বটা ক্রমবর্ধমান হারে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ মহাবিশ্বটা সসীম। ইসলামের সামগ্রিক বিশ্লেষণ একত্র করলে কোনো বিজ্ঞানী স্বীকার না করে পারবেন না যে, মহাবিশ্বটা সসীম।

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যই আল-কুরআনে উন্মোচন করে দিয়েছেন। সর্বাধুনিক বিজ্ঞানও যার কাছে হার মানে।

تَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

Blessed be He who is best of the Creators.

পরম কল্যাণময় তিনি যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা।

উপসংহার

ইসলাম বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান ধর্ম। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে এই ধর্ম পৃথিবীবাসী মানুষকে উপহার দেন। এই ধর্ম ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে টিকে আছে ও আজো এর আবেদন প্রসারমান। যে কারণে ইসলাম আজো তার প্রভাববলয় বিস্তৃত করতে পারছে তাহলো এর আধুনিকতা। আধুনিকতার প্রধান চিহ্ন হলো বিজ্ঞান। আর ইসলাম শুরু থেকে বিজ্ঞানকে ধারণ করেছে, বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছে।

পাঠক, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে বহুকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জ্ঞানপীঠেও ইসলামকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে প্রচার করা হয়ে আসছে এবং এখনও এই প্রচারণা চলছে। কিন্তু বিষয় বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, প্রতিপক্ষ নয়। এই কথাটি আপনাদের নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে যদি আমরা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআনে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ এবং সাম্প্রতিক বিজ্ঞানভাবনা ও ইসলামের দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র আলোচনা করি। আমি একে একে এই প্রসঙ্গগুলো সংক্ষেপে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা প্রসঙ্গ:

প্রাচীনকাল থেকে মানবসমাজে বহুদেবতা ও ইশ্বরের পূজা-অর্চনা করে আসছে। বর্তমানকালেও অনেক সমাজে এসব বিদ্যমান। ইসলাম বহুইশ্বরের ধারণা নাকচ করে দিয়ে একজন ইশ্বরকে এই বিশ্ব ও মানুষের স্রষ্টা, প্রভু ও পালনকর্তা হিসেবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম মূলতঃ এক আল্লাহয় বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। এক আল্লাহয় বিশ্বাস মানবসমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মানুষের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা মানুষের মনকে ধীর ধীরে বিজ্ঞানমুখী করেছে। উদাহরণস্বরূপ মদিনায় অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশুপুত্র ইব্রাহিমের (রা.) মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন। তখন লোকেরা বলছিলো যে, ইব্রাহিমের মৃত্যুশোকে সূর্যগ্রহণ হলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বললেন, সূর্যগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। এর সাথে ইব্রাহিমের মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভূমিকা একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের যথাযথ আচরণ। এর ফলে তখনকার সমাজের মানুষ জগত সম্পর্কে তাদের প্রচলিত ভ্রান্ত ধরাণা থেকে মুক্ত হয়ে জগতে প্রকৃতির এক অনড় অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হলো। এই ধারণা বিজ্ঞানের উন্মেষে বিরাট অবদান রেখেছে। এর ফলে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাকৃতিক কারণ খোঁজার প্রেরণা পেয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অনেক ঘটনা রয়েছে যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, বিশ্ব আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন মেনে চলে। কুরআনের একটি আয়াত এ সম্পর্কে আমাদেরকে আলোকিত করবে। সূরা রুমের ত্রিশতম আয়াতের অংশবিশেষ এমন:

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

"There is no change in the creation of Allah."

"আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন নেই।" (রুম (৩০): ৩০ অংশ)

এর অর্থ আমার কাছে এরূপ যে, একটি বস্তু একই কারণে একই পরিণতি লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে পরিমাণ তাপে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি বাড়ে, সেই পরিমাণ তাপে সর্বকালেই ঐ বস্তুর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রিই বাড়বে। কম বা বেশি নয়। মোটকথা আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুই

প্রাকৃতিক নিয়মানাধীন। প্রসঙ্গক্রমে অন্য আরেকটি আয়াত উল্লেখ করছি। সূরা তোয়া-হার ৫০তম আয়াত:

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

"He (Musa A.) Said: "Our Lord is He Who gave to each [created] thing its form and nature, and further, gave [it] guidance."

"তিনি (মূসা আ.) বললেন: 'আমাদের পালনকর্তা তিনি যিনি প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুকে যথাযথ আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়েছেন এবং তারপর তাকে পথপ্রদর্শন করেছেন।" (তোয়া-হা (২০): ৫০)

এখানে যে পথ দেখানোর কথা বলা হয়েছে তা আমার দৃষ্টিতে ভৌত বিশ্বের বস্তুসমূহের মেনে চলা বৈজ্ঞানিক আইন-কানুন ছাড়া আর কিছু নয়।

কুরআনের বিজ্ঞান প্রসঙ্গ অনেক, যা আমি পরে এ উপসংহারের আলোচনায় আনার ইচ্ছা করছি। এখন যে দু'টি আয়াত উল্লেখ করলাম তা এজন্য যে, আমি বলতে চাই বিজ্ঞানের ভিত্তি আল-কুরআনে পরিষ্কার। এ গ্রন্থের চল্লিশটি পরিচ্ছেদে বৈজ্ঞানিক আয়াতমালার ওপর বিশদ আলেচনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এটি প্রমাণিত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে ইসলামের প্রথম যুগেই একটি পরিচ্ছন্ন বিশ্ববীক্ষা তখনকার শিক্ষিত লোকদের অর্জিত হয়েছিলো। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তী প্রায় পাঁচশ' বছর আরব তথা মুসলিম বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছিলো। আর এই সময়ই ছিলো ইউরোপের ইতিহাসের অন্ধকারতম যুগ। যে মধ্যযুগীয় অন্ধকার যুগের কথা বর্তমানকালের বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই বলে থাকেন, তা ইসলামী বিশ্বকে নির্দেশ করে না, বরং খ্রিস্টীয় ইউরোপবাসীর অন্ধকার যুগকে নির্দেশ করে।

যাহোক, ইসলামের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিরোধানের পর অত্যল্প কালের মধ্যে মুসলিম বিশ্বের দিকে দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শিখর স্পর্শ করে। এ সম্পর্কে 'ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা' নামক গ্রন্থে বিপ্লবী

এম. এন. রায় লিখেন, “আব্বাসীয়, ফাতেমীয় এবং ওমাইয়াদের গৌরবোজ্জ্বল শসনামলে একইসঙ্গে এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং স্পেনে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। সমরকন্দ ও বুখারা থেকে ফেজ এবং কর্দোভা পর্যন্ত অসংখ্য পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং সঙ্গীত বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেছেন। গ্রিক দর্শন এবং শিক্ষার অমূল্য সম্পদ চাপা পড়ে গিয়েছিলো খ্রিষ্টীয় চার্চের অসহিঞ্চুতা এবং কুসংস্কারের নিচে। আরবরা না থাকলে তা একেবারেই হারিয়ে যেতো এবং এমন দুর্ঘটনার দুঃখজনক পরিণতি সহজেই অনুমান করা যায়।” এম. এন. রায়ের এই বক্তব্যের সাথে ইসিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রই একমত হবেন।

আটশ’ তোরো ঈসায়ী সাল থেকে আটশ’ তেত্রিশ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত বিস্তৃত আব্বাসীয় খলিফা আল-মামুনের (৭৮৬-৮৩৩) শাসনামলকে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা হয়। আল-মামুন জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য দেশ-বিদেশের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ, ঐতিহাসিকদের নিজের দরবারে জড়ো করেন এবং ‘দারুল-হিকমা’ বা জ্ঞান-নিকেতন প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের গবেষণার সর্ববিধ সুযোগ ও ব্যবস্থা করে দেন। আল-মামুন এসমস্ত পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায় হিব্রু ও গ্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আরবিতে অনুবাদ ও রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই সুধীমণ্ডলী কেবল অনুবাদ করেই তৃপ্তি পান নি, তাঁদের অনেকেই মৌলিক ও সৃষ্টিধর্মী রচনার মাধ্যমে মহাকালের পাতায় অনন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

এ পর্যায়ে আপনারা হয়তো মুসলিম বিজ্ঞানীদের কিছু সুনির্দিষ্ট অবদান জানতে উন্মুখ। তাই আমি জ্যোতির্বিজ্ঞানে কীরূপে মুসলিম বিজ্ঞানীরা অন্তর্ভুক্ত হলেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলছি।

ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সামনে একে একে তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয় যার প্রত্যেকটিই মুসলমানদের ইবাদতসংশ্লিষ্ট। প্রথম চ্যালেঞ্জটি আসে চন্দ্র-বর্ষপঞ্জী থেকে। মুসলমানদের সিয়ামের মাস রামাদ্বানের হিসাব রাখতে সেকালে যেমন এখনও তেমনি সমস্যা দেখা দেয়।

প্রথম যুগের মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এজন্যে একটি ভারতীয় সমাধানের সূত্র ধরে অনেক বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম হিসাবসম্বলিত চার্ট (রেখাচিত্র) তৈরি করেন, যার মাধ্যমে চান্দ্র্যমাসের শুরুতে নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু তা বলা যেতো।

দ্বিতীয় সমস্যা যা ইবাদত-সংশ্লিষ্ট ও জ্যোতির্বিজ্ঞান-নির্ভর তা হলো মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্ধারণ। প্রথমদিকে যুহর এবং আসরের নামাযের সময় নির্ধারণের জন্য একটি কাঠির ছায়ার দৈর্ঘ্য হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত ভারতীয় ফর্মুলা ব্যবহৃত হতো। এই ফর্মুলাকে সুনির্দিষ্ট ঘণ্টা-মিনিটে রূপান্তর করা ছিলো তখনকার জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। নবম শতকের প্রথম দিকে দারুল-হিকমার সদস্য বিজ্ঞানী আল-খারিজমী (৭৮০-৮৫০) বাগদাদ শহরের জন্য নামাজের সময়ের চার্ট প্রস্তুত করেন। এজন্য আল-খারিজমী অত্যন্ত জটিল Spherical trigonometry (গোলকাকার ত্রিকোণমিতি) -এর সাহায্য নেন। আমি আল-খারিজমীর সকল অবদান আলোচনা করছি না- বিধায় তাঁর প্রসঙ্গে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হবো যে, আল-খারিজমীই বীজগণিতের উদ্ভাবক এবং তিনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদদের একজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের তৃতীয় চ্যালেঞ্জ যা মুসলমানদের ইবাদত-সংশ্লিষ্ট তা হলো 'কিবলা' নির্ধারণ। এ বিষয়ে একাদশ শতকের চমকপ্রদ সাফল্য হলো মক্কাকেন্দ্রিক পৃথিবীর মানচিত্র উদ্ভাবন যা থেকে কিবলা কোনদিকে এবং মক্কা শরীফ কতদূর তা সহজেই বের করা যেতো। এভাবেই মুসলমানদের ইবাদত-সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমাধানের পথ ধরে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতে অসামান্য দক্ষতা দেখান ও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

এবার পুনরায় আমি এম. এন. রায়ের গ্রন্থ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেবো। তিনি লিখেন: "পদার্থবিজ্ঞান বলতে আজ আমরা যা বুঝি, সেই জড়বিদ্যার আসল প্রতিষ্ঠাতা আরবরা।" এবার শুনুন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালামের (১৯২৬-১৯৯৬) কথা। তিনি বলেন, সর্বকালের

সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী হলেন হাসান ইবনে আল-হায়সাম (৯৬৫-১০৪০)। আল-হায়সাম পশ্চিমাদের কাছে 'আলহাযেন' নামে সুপরিচিত।

আল-হায়সাম নয়শ' পয়ষট্টি সালে স্পেনের কর্দোভার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে কায়রোতে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম দৃষ্টিশক্তি এবং আলোর প্রতিফলন-প্রতিসরণ বিষয়ে গ্রিকদের ভুল ধারণার নিরসন করেন। তিনি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, বস্তুর প্রতিফলিত আলোকরশ্মিই চোখে প্রবেশ করে কোনো বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে। ইতোপূর্বে ধারণা করা হতো যে, চোখ থেকে আলো গিয়ে বস্তুর উপর আপতিত হয়ে বস্তুকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে। এভাবে মূলতঃ হাসান ইবনে আল-হায়সামই আলোকবিজ্ঞানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত 'কিতাব-আল-মানাযির' গ্রন্থখানি বিজ্ঞানজগতে তাঁকে অমর করে রেখেছে।

ইসলাম যে সভ্যতার চেতনা মানবমনে রোপন করেছে তার ফসল অগণিত চিকিৎসক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, গণিতবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, রসায়নবিদ। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধদের নাম উল্লেখও আমার এই উপসংহারের কলেবর অনেক বৃদ্ধি করবে বিধায় সে চেষ্টা আমি করছি না। মূলকথা হলো, বিজ্ঞানের যে ধারাটি বিলুপ্ত হতে চলেছিলো, ইসলামের অভ্যুদয় তা বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পায় এবং নতুন করে বিজ্ঞান জন্ম নেয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের গবেষণার মাধ্যমে। পুনরায় এম. এন. রায়ের কিছু কথা শুনুন। তিনি লিখেন, "অসার ধর্মানুরাগ এবং সাধুতার ভণ্ডামী খ্রিস্টানদের উসকিয়ে দিয়েছিল প্রাচীনকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অপবিত্র বলে অবজ্ঞা করতে। এই মূর্খতার অহঙ্কারের পরিণতিতে ইউরোপের জনগণ মধ্যযুগের অন্তহীন অতল অন্ধকারে তলিয়ে যায়। প্রাচীন গ্রিক সাধকরা জ্ঞানের যে স্বর্গীয় আলোকবর্তিতা জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন তা নতুন প্রাণশক্তিতে বেঁচে ওঠায় অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যা সংস্কার এবং অসহিষ্ণুতার দুঃসহ আঁধার কেটে গেলো। আর ইউরোপের জনগণ খুঁজে পেলো ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি, বুদ্ধির অগ্রগতি এবং সেই সাথে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ। আধুনিক যুক্তিবাদের জনক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রদূতরা গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছেন আরব দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের মাধ্যমেই।"

সভ্যতার চাবিকাঠি কোনো এক জাতির কাছে অনন্তকাল থাকে না। আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মেই কোনো জাতি সভ্যতার শিখর স্পর্শ করে, আবার সেই নিয়মেই ঐ জাতি গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হয়। ইসলাম এবং মুসলমানেরা বিজ্ঞানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে, বিজ্ঞান নির্মাণ করেছে। গ্রিকদের কাছ থেকে, ভারতীয়দের কাছ থেকে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান মধ্যযুগের মুসলিমরা পেয়েছিলো তা শতগুণে বাড়িয়ে তুলে দিয়েছিলো ইউরোপীয়দের হাতে। এভাবেই ইসলাম বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় এক অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। তাই বর্তমান যুগের আধুনিকতা নির্মাণে মুসলমানদের অবদান অস্বীকার করা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। যারা ইসলামকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ ভাবেন বা উপস্থিত করেন তারা নিতান্তই অজ্ঞ ও ইতিহাস-অসচেতন। আমি সকলকে ইসলাম ও বিজ্ঞানের ইতিহাস একত্রে মিলিয়ে পাঠ করার আহ্বান জানিয়ে উপসংহারের এ পর্যায়ে দ্বিতীয় মূল প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছি।

আল-কুরআনে বিজ্ঞান প্রসঙ্গ বহুভাবে বহুবার এসেছে। আল-কুরআন মানুষকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত হতে বহুভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমি সূরা আলে-ইমরানের ১৯০ ও ১৯১ এ দুটো আয়াত উল্লেখ করতে চাই। বলা হয়েছে:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *

"Behold! in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day,- there are indeed Signs for men of understanding,- Men who celebrate the praises of Allah, standing, sitting, and lying down on their sides, and contemplate the [wonders of] creation in the heavens and the earth, [With the

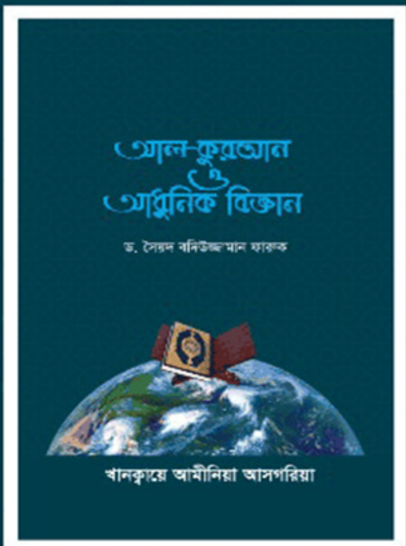
thought]: "Our Lord! Not for naught Hast Thou created [all] this! Glory to Thee! Give us salvation from the penalty of the Fire."

"নিশ্চয় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) প্রভু! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করো নি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।" (আলে-ইমরান: ১৯০-১৯১)

এই আয়াতদ্বয় অতীতে যেমন আজও তেমনি কুরআন পাঠকারীকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্রত হতে উৎসাহ দেয়। পাশাপাশি কুরআন মানুষকে মহাবিশ্বের অনেক বিষয়ের সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছে। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সেসব বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিতবহ বহু আয়াতের মধ্যে ত্রিশ-চল্লিশটির ব্যাখ্যা তুলে ধরেছি। উদাহরণস্বরূপ এখানে সূরা আম্বিয়ার ত্রিশমত আয়াতের প্রতি পুনরায় লক্ষ করুন: "অবিশ্বাসীরা কী ভেবে দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একত্রে মিলিত ছিলো, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (আম্বিয়া: ৩০) গ্রন্থে আমরা এই আয়াতের ব্যাখ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করেছি।

ইসলাম বিশ্বের এক মহাদুর্যোগময় কালে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে অবনতির অতল অন্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে। মানবজাতিকে জীবনচলার সঠিক পথ দেখিয়েছে। ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির উপায় হিসেবে ও বিশ্বদৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের কাছে মহান ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন আজো বিদ্যমান। এই মহাগ্রন্থ অতীতে যেমন আজও তেমনি মানুষকে পথপ্রদর্শন করছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ইঙ্গিত ও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। ইসলাম মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

এ উপসংহার শেষ করার পূর্বে একটি কথা বলতে চাই। ইসলাম একটি জীবন-যাপন পদ্ধতি ও পাশাপাশি একটি বিশ্ববীক্ষা মানুষকে উপহার দিয়েছে। ইসলামের রয়েছে ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে ইসলাম অনুশীলন অসম্ভব। মুসলিম হিসেবে আমরা বিজ্ঞানের সাধক হবো- তবে তা যেনো আমাদেরকে ইসলামের মৌলিক অনুশীলন থেকে দূরে না নিয়ে যায়। মহান আল্লাহর কাছে মুসলিম জাতির পুনরুজ্জীবন কামনা করি। যেনো আবার মুসলিম জাতি আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সকল ক্ষেত্রে বিশ্বমানবের পথপ্রদর্শক হয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণের ধারা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।



Design and Print
Horf Media, Sylhet. 01723-095376

প্রকাশনায়
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া